হাইলাকান্দি

বাংলা নিউজ ম্যাগাজিন

২০২৩ ইং

প্রতিমাতে নয়,
প্রতি মা'তেই দুর্গা

মামার দিল্লি যাত্রা

মুখ্যমন্ত্রীর মর্জিতেই করিমগঞ্জ লোকসভা !

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব
হবিবুর রহমান চৌধুরী

এক আসন তিন বিধায়ক

আরও আছে গল্প কথা কবিতা

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানায়

আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন -

হাইলাকান্দি মিউনিসিপ্যাল বোর্ড

কল্যাণ গোস্বামী

চেয়ারম্যান

হাইলাকান্দি মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, হাইলাকান্দি

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে সবাইকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

কামনা করি, পুজোর দিনগুলো নির্বিঘ্ন ও আনন্দমুখর হয়ে উঠুক -

লালা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড

তুরসি রায়

চেয়ারপার্সন

লালা মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, লালা

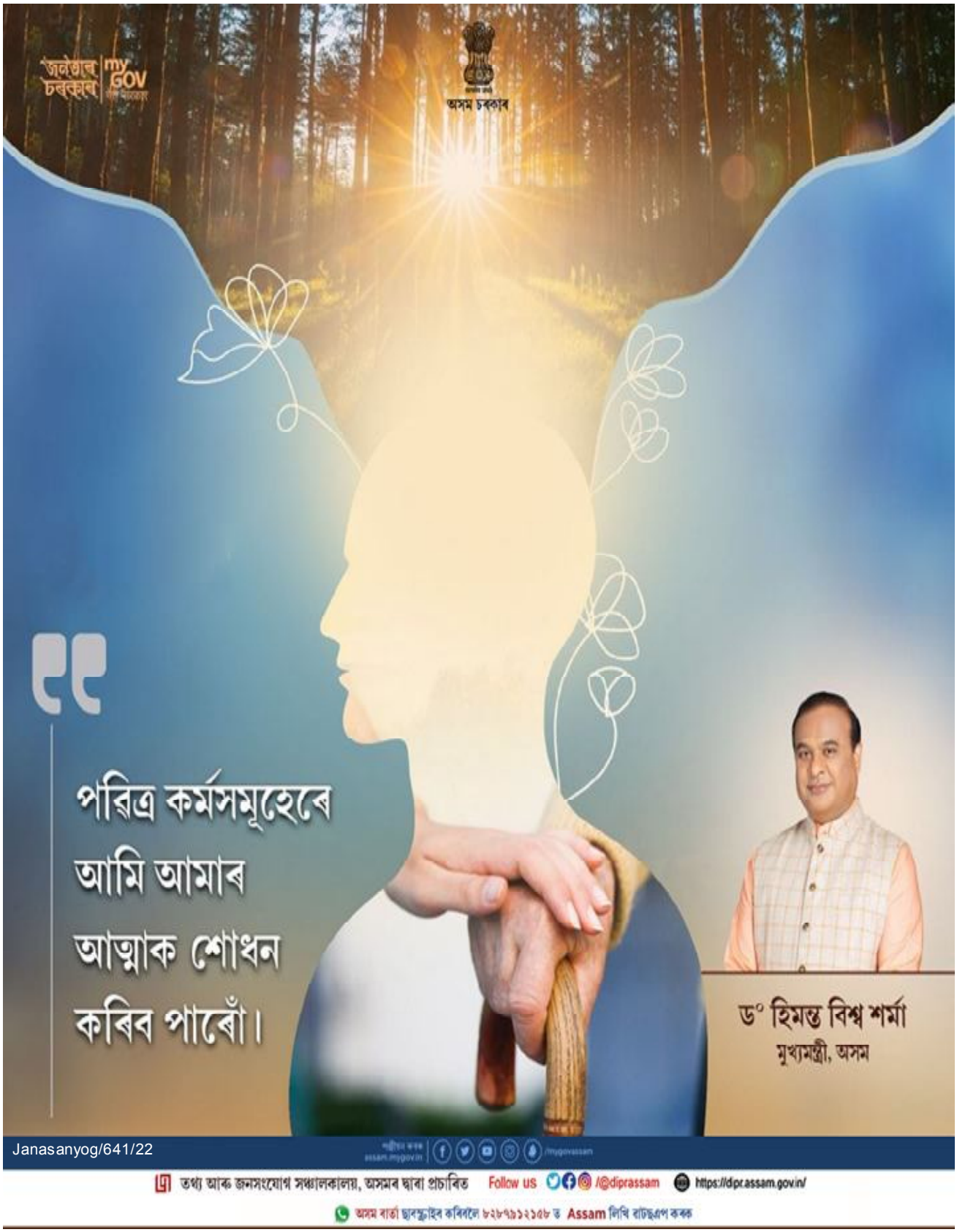

অসম চৰকাৰ
পৱিত্ৰ কৰ্মসমূহেৰে
আমি আমাৰ
আত্মাক শোধন
কৰিব পাৰোঁ।
ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মুখ্যমন্ত্ৰী, অসম
Janasanyog/641/22
তথ্য আৰু জনসংযোগ সঞ্চালকালয়, অসমৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত
Follow us /@diprassam
https://dipr.assam.gov.in/
Assam

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানায়
আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জল জীবন মিশন

হাইলাকান্দি

ঘরে ঘরে বিশুদ্ধ জল

- **গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি ঘরে বিশুদ্ধ পানীয় জল।**
- **প্রতিদিন প্রতিটি ঘরে জনপ্রতি।**
- **নূন্যতম ৫৫ লিটার।**
- **বিশুদ্ধ পানীয় জল।**

এটি আপনার প্রকল্প, এই প্রকল্পকে কার্য্যক্রম করে রাখা আপনার কর্তব্য

জিলাস উদ্দিন লস্কর

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, পি.এইচ.ই,
হাইলাকান্দি

বাংলা নিউজ ম্যাগাজিন

হাইলাকান্দি

RNI Regd No- Rn- 64351/96
বর্ষ - ২৮, অক্টোবর-ডিসেম্বর-২০২৩

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
নুরুল মজুমদার

মুখ্য সম্পাদক
অমিত রঞ্জন দাস

সম্পাদক ও প্রকাশক
জেরিন আক্তার মজুমদার

অলঙ্করণ
কবীর মজুমদার

সহযোগিতায়
নজমুল ইসলাম তাপাদার

বর্ণ বিন্যাস
নূর আহমেদ চৌধুরী

মুদ্রণে:
মেসার্স নিউ জামাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
হাইলাকান্দি - ৯৪৩৫২২০০০৯

যোগাযোগ
সম্পাদক, হাইলাকান্দি
(বাংলা নিউজ ম্যাগাজিন)
কলেজ রোড, লালা, ওয়ার্ড নং:-১০
পো:-লালা-৭৮৮১৬৩, হাইলাকান্দি
অসম।
email-nmazumderhkd@gmail.com
Cell-8638898750/9435179030

মূল্য ঃ ₹৫০ টাকা মাত্র।

শারদ সংখ্যা
২০২৩

সূচিপত্র

১।	**সম্পাদকীয়**	আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ ৪
২।	**দেবী প্রসঙ্গ**	প্রতিমাতে নয়, প্রতি 'মা'তেই দুর্গা ৫
		পূজোর স্মৃতি ঃ আমার শৈশব ৬
৩।	**প্রচ্ছদ নিবন্ধ**	মামার দিল্লি যাত্রা ৮
৪।	**বিশেষ প্রতিবেদন**	মুখ্যমন্ত্রীর মর্জিতেই করিমগঞ্জ লোকসভা ১১
৫।	**বিশেষ প্রতিবেদন**	বিশ্বাসীরাই প্রকৃত প্রগতিশীল
৬।	**রাজনীতি**	ডিলিমিটেশন : এক আসন তিন বিধায়ক ১৩
৭।	**আলোকপাত**	বিশ্বাসীরাই প্রকৃত প্রগতিশীল ১৫
		চেতনাবোধের অবক্ষয় ১৮
৮।	**ব্যক্তি বিশেষ**	ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব : হবিবুর রহমান চৌধুরী ১৯
		এক নীরব সংগ্রামের নাম হবিবুর রহমান চৌধুরী ২৩
		বাহারুল ইসলামের চোখে হবিবুর রহমান চৌধুরি ২৫
৯।	**গল্প**	কখন অন্য মনে ২৮
		মনস্তাত্ত্বিক ২৯
		আপনজন ৩১
		ভ্যালেন্টাইন ডে ৩২
		অভিশপ্ত রাত ৩৩
		অন্তর্দ্বন্দ্ব ৩৪
		দেশপ্রেম ৩৫
		মানবী ৩৬
		শিল্পী ৩৮
		ভালবাসা ব্যবসা হয়ে গেছে ৩৯
১০।	**কবিতা**	সন্ধ্যাতারা ৪২, শারদীয়া ৪২, কালো ভ্রমর ৪২
		জীবনের ঝরা পাতা ৪২, খুঁজে ফিরি শঙ্খ-ঝিনুক ৪৩
		আমাদের বরাক ৪৩, ভালবাসা তবু আজ ব্যর্থতার পরিহাস ৪৩
		ভালোবাসার জয় ৪৪, সহজাত প্রবৃত্তি ৪৪, মুখোমুখি ৪৪
		গল্প ৪৪, ক্ষুধার্ত মানুষের কান্না ৪৪, বিক্রম গেছে মামাবাড়ি ৪৫
		আগমনি ৪৫, কাশবনে ৪৫, বউ-শ্বাশুড়ি ৪৫, গরম রক্ত ৪৫
		জিজ্ঞাসা ৪৬, পুজোর বার্তা ৪৬, ক্ষমা করো প্রভু ৪৬
		কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ৪৬
১১।	**স্মৃতিচারণ**	হারানো মানুষ জড়ানো স্মৃতি ৪৭

সম্পাদকীয়

আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণ

মেঘের আদ্রতা শেষে প্রকৃতির মুখে এখন হাসি। নীলাভ আকাশের বুকে সাদা মেঘের উড়ে বেড়ানোর দৃশ্য মনে করিয়ে দিচ্ছে শরত এসেছে। কেলেন্ডারের পাতা ঘুরে শরত এসেছে শারদীয় উৎসবের বার্তা নিয়ে। প্রতিবারের মত আনন্দময়ী আসছেন মানুষের পৃথিবীতে। ধনী দরীদ্র জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার ঘরে আসছেন আনন্দময়ী।। শরতরাণীর আগমনে পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে উৎসবের আবহ। এই উৎসবে সামিল সবাই। আনন্দময়ীর আগমনে বিশ্বের আপামর বাঙালি অবগাহন করছেন মহামিলনের মহাযজ্ঞে। শারদ উৎসবের এই খোলা হাওয়ায় আপনমনে ডুব দিচ্ছেন প্রতিজন মানুষ। সেই অনন্তকাল ধরে ভক্তের বিশ্বাস অশুভের বিনাশ ঘটিয়ে শুভের প্রতিষ্ঠা হেতু দেবী দুর্গা আসেন পৃথিবীতে। আসেন সবার ঘরে ঘরে। শান্তি-সম্প্রীতি আর সমৃদ্ধির বার্তা পৌঁছে দেন মানব সমাজে। দেবী দুর্গার আগমনে পৃথিবী জুড়ে আরম্ভ হয় আনন্দযজ্ঞ। আর এই আনন্দযজ্ঞে সামিল হয়ে অভাব অনটন আর অশান্তি থেকে মুক্তির পথ খোঁজেন মানুষ। তাইতো মৃন্ময়ী মূর্তিতে চিন্ময়ী মাকে খোঁজে পান ভক্তরা। যারদরুন অসুরনাশীনি দেবী দুর্গা মর্তে আসেন আনন্দময়ীর রূপে। দুর্গাপূজা মূলত ধর্মীয় উৎসব হলেও আজকাল আর তা ধর্মীয় গন্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। দুর্গাপূজা এখন শারদ উৎসব। বিশ্বের সর্ববৃহৎ সার্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিনত হয়েছে। আজকের দিনে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এই উৎসব প্রতিজন মানুষের প্রানের উৎসব। সেই অতীত থেকেই শারদ উৎসব সামাজিক ভেদাভেদ দূর করে সম্প্রতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করে আসছে। উৎসবের এই আবহের মধ্যেও বিশ্বব্যাপী মন্দাভাব, ইজরায়েল হামাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ আর আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বিশ্ববাসী জর্জরিত। বিশেষ করে গাজা ভুখন্ডে মৃত্যুর বিভিষিকায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মন বিষাদগ্রস্ত। এই যুদ্ধ স্থায়ী হলে বিশ্ব অর্থনীতিতে তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে। আর অর্থনীতির এই বিরুপ প্রভাবের কূ-ফল ভোগতে হবে সাধারণ মানুষকে। তাই যুদ্ধের দামামা বন্ধ হোক, গাজায় শান্তি ফিরুক এটাই কামনা করছেন সাধারণ মানুষ। মৃত্যু কখনও কাম্য নয়। তা যখন যেখানে যেভাবেই হোক না কেন। তাই বিশ্ববাসীর কল্যাণে ইজরায়েল হামাসের যুদ্ধ এখনই বন্ধ হওয়া জরুরি। আর এক্ষেত্রে বরাবর শান্তির পক্ষে থাকা ভারতের অগ্রনী ভুমিকা পালন করা উচিত। তবে আমাদের বিশ্বাস যাবতীয় সমস্যার সমাধান হবে। বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। শারদ উৎসবের আনন্দযজ্ঞে সবাই সামিল হবে। ধর্ম থাকবে যার যার উৎসব হবে সবার। আনন্দময়ীর আগমনে সুখ শান্তি আর সমৃদ্ধির বার্তা ছড়িয়ে পড়বে ঘরে ঘরে। আনন্দময়ীর আগমনে বিশ্বব্যাপী আয়োজিত এই আনন্দযজ্ঞে সবাইকে সামিল হওয়ার আহবান। শারদ উৎসবের এই ঐক্যতানের হাত ধরে ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত হবে, আজকের দিনে এই শুভ কামনা রইল।।

প্রতিমাতে নয়, প্রতি 'মা'তেই দুর্গা

- সীমারেখা দাস -

শরৎকালে বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই উৎসবে যে দেবীমূর্তি পূজিত হন তিনি অসুর দলনী দশপ্রহরণধারিনী দুর্গা। সঙ্গে তার পুর্ত-কন্যারাও থাকে। কার্তিক, গণেশ লক্ষ্মী ও সরস্বতী।

এই মহিষাসুরমর্দিনী দেবী দুর্গা বাঙালির কাছে সকল দুর্গতি নাশিনী বলে আরাধিত। তিনি বাঙালির সমস্ত দুঃখ দুর্দশা দূর করবেন বলে মনে করা হয়। তাই তাঁর আরাধনায় এতো ধূম।

কিন্তু সত্যিই কে সেই প্রতিমার মধ্যে দুর্গা থাকেন? আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বলা যায় থাকেন। কারণ পূজার সময় তার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু তিনি কি সত্যিই সকলের দুঃখ-কষ্ট ঘুচিয়ে দিতে পারেন? এক্ষেত্রে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও বলা যায় দেবী দূর্গার সকলের দুঃখ-দুর্দশা ঘোচানো সম্ভব নয়। তাতে যার যতোই দেবীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা থাকুক না কেন?

কিন্তু আমরা যদি প্রতিমাতে নয়, প্রত্যেকে নিজের নিজের মায়ের মধ্যে দুর্গাকে খোঁজার চেষ্টা করি, তাহলে হতাশ হতে হবে না। মায়েরা সর্বংসহা। হাজার বাধা-বিপত্তি দুঃখ আসুক মা-দের সন্তানের প্রতি ভালবাসা এতটুকু হেরফের হয় না। সন্তানকে সব সময় বুকে করে আগলে রাখেন। শত দুঃখ-কষ্ট আসুক, সন্তানকে তা থেকে দূরে রাখেন। এর জন্য যদি তাকে প্রাণ দিতে হয় তবে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতে পিছপা হন না। তবু দুঃখের এতটুকু আঁচ তাদের সন্তানদের লাগতে দেন না। মায়েরাই সন্তানের জন্ম দেন। এরজন্য মা-দের গর্ভযন্ত্রনাও প্রসব বেদনা সহ্য করতে হয়। সন্তানের মুখ দেখে মায়েরা সে কষ্ট ভুলে যান। এটা শুধু মায়েদের দ্বারাই সম্ভব। মা-দের এরপর অসহায় মানব শিশুকে ধীরে ধীরে বড়ো করে তোলার পেছনে কত শ্রম ও আত্মত্যাগের ইতিহাস থাকে। তা মানুষ মাত্রেরই অজানা নয়। বড় হবার পরও মা-রা সন্তানদের চোখের আড়াল করতে পারেন না।

এহেন মায়েরা দুর্গা নয় তো কি? তাই দুর্গাকে প্রতিমাতে খোঁজার চেয়ে মায়েদের মধ্যে খোঁজা অধিক যুক্তিযুক্ত হবে। দেবী দুর্গা প্রতিমাতে কতটা থাকেন জানি না। তবে মায়েদের মধ্যে যে তাকে পাওয়া যায় এব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ নেই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

"মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।" সত্যিই 'মা' বলতে যার কথা ... তার তুলনা হয় না।

বঙ্কিম বলেছেন -

"বন্দে মাতরম্....

তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"

একথা খুবই সত্যি আমরা নিজের মাকে অবহেলা করে, প্রতিমার মধ্যে খুঁজে ফিরি। দেবী দুর্গা সকলের মা। আপামর বাঙালি তাকেই মাতৃ সম্বোধন করে সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা মোচনের আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। শরৎকাল এলে প্রকৃতি শিউলি। কাশফুলে সেজে ওঠে। তখনই মায়ের আগমনী সঙ্গীত বেজে ওঠে। সবাই মায়ের রাতুল চরণে আঞ্জলি দিয়ে, নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। এই মা সকলের মা। দেবতারা যখন অসুরদেব পীড়নে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। তখনই তিনি আধিভূতা হয়েছিলেন, তাদের রক্ষার জন্য।

এমন একজন দেবী, যিনি কঠিন কঠোর মূর্তিতে দশপ্রহরণধারিনী রূপে শরৎকালে বাঙালিদের দ্বারা পূজিত হন ঠিকই কিন্তু তার মধ্যে আমরা ঘরের মেয়েকেই খুঁজে ফিরি। যিনি বৃদ্ধ স্বামীর গৃহে পুত্র-কন্যা নিয়ে অশেষ দুঃখের মধ্যে জীবনযাপন করেন। বছরের তিনটি দিনের জন্য বাপের বাড়ী আসার আগ্রহে দিন গোনেন। সেই গৌরীদান প্রথার বলি কন্যা সন্তানদের বাপের বাড়ী আসার আনন্দ দূর্গাপূজায় অনুভব করি। কন্যাদের আমরা মা-বলেই সম্বোধন করি। গর্ভধারিনী মা হোক বা কন্যা সন্তান যা হোক, তাদের অবলা, দুর্বল বলে মনে করা হলেও, আসলে তারা মোটেই দুর্বল নন, তাদের মধ্যেই আমাদের শক্তি নিহিত। শিব শক্তিবিনা শব মাত্র। নারীই তাকে শক্তি যোগায়। তাই প্রতিমাতে আমরা বৃথাই থাকে অর্থাৎ দুর্গাকে খুঁজে বেড়াই। নারীজাতি অর্থাৎ মাতৃজাতির মধ্যে তিনি রয়েছেন। নারী যখন আত্মচেতনা লাভ করবে। 'আত্মা নাং বিধি' অর্থাৎ নিজেকে জানবে। তখনই যথার্থ মাতৃশক্তির উদ্বোধন ঘটবে। শাস্ত্রে বলেছেন "কুপুত্র যদিবা হয়, কুমাতা কখনো নয়"। কুপুত্রের উদাহরণ তো এখন সর্বত্র পরিদৃষ্ট, নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো তার ঝলন্ত উদাহরণ। তাদের নারী জাতির উপর অত্যাচার, লাঞ্ছনার ভূরি ভূরি উদাহরণ রয়েছে। তবু মায়েরা কখনো সন্তানের অমঙ্গল কামনা করে না। শাসন ব্যবস্থায় নারী জনসমাজের অর্ধাংশ হওয়া সত্ত্বেও এক তৃতীয়াংশ অধিকার লাভের জন্য এখন তাদের মুখাপেক্ষী হওয়া সত্ত্বেও আশাকরি এমন একটি দিন আসবে, যেদিন নারী তার অধিকার নিজেই বুঝে নেবে। সেদিন প্রতিমাতে নয়, সমস্ত নারীজাতির মধ্যে তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

<><><><><>

পূজোর স্মৃতি ঃ আমার শৈশব

- ঝুমুর পাণ্ডে -

শৈশব বেলার পূজোর স্মৃতির কথা বলতে গেলেই আমার চোখের পাতায় ভেসে ওঠে সেই কাটলিছড়া চা-বাগানের দুর্গামণ্ডপ, নাচঘর, সাজঘর, যাত্রাপালা, মেলা, বাঁশের বাঁশি, বেলুনের খসখস, প্রসাদের থালা হাতে নিয়ে মহিলাদের হেঁটে যাওয়া। নারায়ণ পালের মূর্তি গড়া। আহারে সেই কাটলিছড়া চা বাগান, আমার প্রিয় জন্মভূমি। ওই স্মৃতির ফুলগুলো মালা হয়ে জড়িয়ে ধরে আমাকে, না আমিই জড়িয়ে ধরি স্মৃতিকে। কে কাকে জড়িয়ে ধরি জানি না। তবে আমি ভীষণ উথাল-পাথাল হই। ওই স্মৃতিগুলো প্রতিনিয়ত আমাকে হাসায়, কাঁদায়, ভাবায়, কখনও বা ঘুম পাড়িয়ে রাখে। এখন পূজো যত এগোয় আমি স্মৃতির ভেতর সাঁতার কাটি। কাটতে কাটতে মুক্তো তুলি। ওই মুক্তো দিয়ে এই সময়ের সুতো দিয়ে মালা গাঁথি। ওই মালা গলায় পরি, হাতে পরি তারপর সারা শরীরে জড়িয়ে নিই।

একমাস আগে থেকেই একটা রব উঠত পুজো আসছে তা বেশি করে বুঝতে পারতাম যখন নাচঘরে পূজোর মিটিং হত। কী হয়েছে? না পূজোর মিটিং। ওই মিটিং শুনলেই খুশির বন্যা বইত শরীরে, এসে গেল পূজো। শেফালি ফুটত। সাদা হয়ে গাছের তলায় ঝরত। ওই সাদা সাদা ফুল পূজোকে আরও কাছে নিয়ে আসত। আমি শেফালি ফুল কুড়োতাম, মালা গাঁথতাম আর ভাবতাম কবে দুর্গার গলায় পরাব। দুর্গাপূজার মিটিং শেষ হলেই দুর্গামণ্ডপে শুরু হত দুর্গা গড়ার কাজ, হর বছর মুর্তি নারায়ণ পালই গড়ত। সবাই বলত নারায়ণের দুর্গা। খুব পরম্পরা মেনে নিষ্ঠা সহকারে গড়ত। নারায়ণের সঙ্গে আমাদের বাচ্চাদের খুব ভাব ছিল। কারণ খড় বাধার সাথেই সাথেই তো শুরু হতো আমাদের প্রতিদিনকার আনাগোনা। আমাদে বাড়ি থেকে খড়নিয়ে যেত। আমরা বাচ্চারা রোজগিয়ে দেখতাম কাজ কতটুকু হল। আমাদের পাঠশালা ইস্কুলের কাছের ছিল মণ্ডপ। এতে আরও সুবিধা ছিল। একশো বার ঢু মারতাম। আমাদের বাড়ি থেকে পুরনো কাপড় নিয়ে যেত নারায়ণ। অন্যদের বাড়ি থেকেও হয়তো আনত। ওই কাপড় মূর্তিগুলোর উপর একবার মাটি দিয়ে লেপটে দিত। ওই মাটির গন্ধ পূজোর গন্ধ হয়ে আমাকে গাগল করে দিত। বাগানের মহিলারা ছুটির দিন দল বেঁধে সাদামাটি আনতে সোনারির জঙ্গলে যেত যেন মাটি আনাও একটা উৎসব। ওই মাটি এনে ঘরের দেওয়াল, ঘর, উঠোন, আঙনা সব নিকিয়ে ফেলত। কেউ কেউ আবার রং দিয়ে দেওয়ালে ফুল, পাতা, ঘরবাড়ি এইসব আঁকত। ওই রং আবার নানারকম পাতার রস বা কাঁচা হলুদ দিয়ে করত। ওই সময় আমি সেগুলো খুব খুঁটিয়ে দেখতাম। দেখতে ভীষণ ভাল লাগত। আসলে চা বাগানে যে বড় হয়নি ও বুঝতেই পারবে না চা বাগানের পূজোর কী যে আনন্দ। আসলে চা বাগানে সব থেকে বড় পরবই হল দুর্গাপূজো।

বাঙালির দুর্গাপূজো কথাটা এখানে বড় বেমানান। কারণ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত তেকে আসা বিভিন্ন জাতির লোকেরা সবাই চা বাগানে মেতে ওঠে দেবী দূর্গাকে নিয়ে। কবে, কখন বাংলা বাবুর বাড়ি থেকে দুর্গাপূজা বারোয়ারি হল এবং বিভিন্ন চা বাগানে বিভিন্ন প্রদেশের জাতি উপজাতি প্রধান পর্ব হয়ে উঠল সে আরেক ইতিহাস। তবে জানা যায় **১৮৩২ ইংরাজিতে ইংরেজ কাছাড় দখল করে নেয় এবং ১৮৫৬ থেকে এখানে টা চাষের সূচনা হয়।** দেশী দালালরা সাহেবদের নির্দেশে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নিয়ে আসে শ্রমিক। এই দেশীয় দালালদের বলা হত আড়কাঠি। বাবু এবং শ্রমিকদের উৎসাহে প্রথম থেকেই বরাকের চা বাগানগুলোতে দুর্গাপূজা শুরু হয়ে যায়।

অনেক বাগানে নাকি সাহেবদেরও পূজার ব্যাপারে উৎসাহ ছিল। রোজকান্দি বাগানের এক সাহেব নাকি বাবুদেরকে বলতেন 'ভিখ মাঙনেওয়ালা প্রিস্ট মত আনো,' পূজোর সময় এক শ্রেণির ব্রাহ্মণ কাছাড়ে এসে ভিক্ষা করত। এবার ছিল সাহেবদের কাছে ভিখ মাঙনেওয়ালা প্রিস্ট। কোনও কোনও বছর বাগানে যাওয়ার রাস্তায় জল থাকত। শ্রমিকরা নৌকা নিয়ে আসত পুরোহিতকে নেওয়ার জন্য। এই শ্রমিকদের কাছে নাকি সাহেবের নির্দেশ থাকত প্রিস্ট একবার নৌকায় উঠে গেলে ওকে আর নামানো যাবে না। কারণ, এতে তাঁর অসম্মান হবে। যেখানে জল নেই সেখানেও প্রিস্টকে নৌকায় রেখে টেনে নিয়ে যেতে হবে.

তবে অন্য রকমও শোনা যায়, কাটলিছড়া চা বাগানে নাকি দূর্গা পূজো শুরু করতে রীতিমতো লড়াই করতে হয়েছিল ওই বাগানের দুই বাবুকে। পরে অনেক কষ্টে কিছু শ্রমিকদের নিয়ে ওখানে পূজা শুরু করেছিলেন ওই দুই বাবু (মৃত্যুঞ্জয় পাণ্ডে ও সতীশ রায়)। বাগানের পূজো নিয়ে যখন এত গল্প কথা তখন বাগানে একটা অন্যরকম আনন্দ তো থাকবেই। আর যেখানে চারদিক সবুজ, নদী, পাহাড়, ঝরণা ও ধানখেত - ঝকঝকে আকাশ, প্রকৃতি যেন সব সময় ওখানে হাসছে, এইজন্য পূজোর সময় আমরা অন্য কোথাও যাওয়ার কথা ভাবতেই পারতাম না। কাটলিছড়া বাজারে দাদুর বাড়ি ছিল। এক বেলার জন্যও দাদুর বাড়ি যেতে চাইতাম না। মূর্তি গড়ার সাথে সাথে নাচঘরের চারদিকে অস্থায়ী দোকানপাটও বানানো শুরু হত। এসবও তখন ঘুরে ঘুরে দেখতাম। কাপড় কেনা হত। নতুন কাপড়ের গন্ধে কেমন নেশা লাগত। আগে সবাই বালিশের ওয়ার থেকে টেবিল ক্লথ সব পূজোর আগে নতুন করত। সেলাই মেশিন চলত। কত কিছু বানানো হত। পিসি স্কুলে চাকরি করত। এসেই বলে যেত সেলাই করতে। সব কিছু মিলিয়ে সত্যিই যেন নেশা। পূজোর কাপড় আসত বাগানে। সবাই কিনত, তবু কারও কারও জামা কাপড় হত না, মানে কিনতে পারত না। এই কিছু কিছু কষ্ট কখনও কখনও সব কিছুকে ম্লান করে দিত। আমাদের বাড়িতে

সবাই খুব পড়তে ভালবাসত। পূজো সংখ্যা কয়েকটা বাবা নিয়ে আসতেন। ওই নতুন সংখ্যাগুলোর গন্ধও পূজোর গন্ধ হয়ে সবকিছু ভরিয়ে দিত আনন্দে। সত্যি তখন যেন সব কিছুতেই আনন্দ। ময়দা, সুজি, নারকেল আনা হত। কত কিছু খাওয়ার জিনিস বানানো হতো কদিন আগে থেকেই। আজকাল সবাই রেষ্টুরেন্টে খায়। আমরা তখন পূজোর সময় ঘরেই খেতাম। বাগানে একটা কথা চালু ছিল পূজোর সময় মাংস না খেলে আর নাচঘরে যাত্রা না হলে পূজো মনেই হয় না। এজন্য সবাই পূজোর এক দুমাস আগে থেকেই পূজোয় খাওয়ার জন্য হাঁস, মুরগি, পাঁঠা খাসি কিনে এনে রাখত।

দুর্গাকে যেদিন রং চড়াত ওইদিন আমাদের আনন্দ দেখে কে, লক্ষ্মীর মুখ এবার কেমন হল সরস্বতী বা কেমন ? অসুরকে নিয়ে কত আলোচনা। তখন আর আলাদা করে শাড়ি পরাত না। মাটির রঙই শাড়ি হয়ে যেত। চক্ষুদান মানে চোখ কখন আঁকবে. এটা নারায়ণ পাল কোনো এক সময় সব কিছুর পর সেরে ফেলত। কিন্তু আমাদের খুব ইচ্ছে হত ওই চক্ষুদান দেখার। কিন্তু কোনোবারই দেখতে পাইনি।

এবার কোথাকার পার্টি আসছে (যাত্রাপালা) এটা একটা খুব বড় খবর হত। ভাল পার্টির নাম শুনলে সবার উৎসাহ বেড়ে যেত। চারপাশের বাগানগুলোর খবরও ভেসে আসত। মণিপুর বাগানে কেমন মূর্তি হচ্ছে। ধলাই বাগানে কোথাকার গান আসছে। ধলাই বাগানে দুটো পূজো হত, একটা শ্রমিকদের আর একটা বাবুদের।

মহালয়ার দিন আরেক আনন্দ। ভোরে উঠে ঘোরাঘুরি আর রেডিওতে চণ্ডীর সেই বিখ্যাত আলেখ্য শোনা। রেডিও তখন খুব কম ছিল। তাই এক জায়গায় অনেক জড়ো হত শোনার জন্য। ষষ্ঠীর দিনই দেওঘরি সাধু (আমরা অবশ্য দাদু বলতাম) আমাদের বাড়ি থেকে বড় পুষ্পথালা, আড়গড়া, বলির দা এইসব নিয়ে যেত। প্রতি বছরই সাধু দেওঘরি হত। দেওঘরি মানে পূজোর কাজে পুরোহিতকে সাহায্যকারী। সাধুর সঙ্গেও ছোটদের খুব ভাব ছিল। আমাকে পূজোর পর ছোট ছোট ঘটগুলো খেলার জন্য দিয়ে দিত। সাথে ওর বউও আসত। কুরকুর কুরকুর এক অদ্ভুত রকমের শব্দ করে উলু দিত। ষষ্ঠীর দিন দুর্গা ঠাকুরের পুরো পরিবার নিয়ে সাজগোজ শেষ হত। অস্থায়ী দোকানপাঠগুলোও সেজে উঠত। কত রকমের দোকান আহারে। চায়ের দোকান, খেলনার দোকান, চুড়ি মালার দোকান, কাপড়ের দোকান। ষষ্ঠী পূজোর দিন রাতে ঠাকুমার সঙ্গে মণ্ডপে যেতাম। ওখানে মালাদি, বুলা ওরাও আসত। মাধুরীদিও যেত। সাধুর বউ কুরকুর উলু দুত। ঢাক বাজাত সুবল। আগে নাকি সুবলের বাবা বাজাত। ফুলও তুলত সুবল। ভোরে সবাই মিলে শেফালি ফুল কুড়োতাম। মালা গেঁথে দিয়ে আসতাম। তখন সুরেশ ঠাকুর (সুরেশ চক্রবর্তী) পুজো করতেন। আমি ওঁকে দাদু ডাকতাম, কার মালা কার গলায় গেল। কারও মালা অসুরের গলায় গেলে ওর মন খুব খারাপ হত। সপ্তমীর দিন থেকেই সারাদিন বন্ধুরা মিলে ঘোরাঘুরি ওই নাচঘরের চত্বরেই। নতুন জামা, চোখে লাল খেলনা চশমা, এককবার ৩২ পান পর্যন্ত খেয়েছিলাম। ওই আমার প্রথম ও শেষ পান খাওয়া। সপ্তমীর দিন গানের পার্টিও আসত। পার্টি এলে ট্রাক বা বাসে করে আসত। তখন সকলের চেঁচামেচি, ওদেরকে দেখতে ভিড় করা। এরা সাজঘরে বা ইস্কুল ঘরেই থাকত। সন্ধের পর রোজ আরতি দেখতাম সবাই মিলে। তারপর মাংস ভাত খেয়ে যাত্রা দেখা। মাধুরীদি আমাদের ডাকতে যেত রোজদিন। পূজোর এই চারদিন সে তখন কী আনন্দে কাটত। বলি হত পাঁঠা, হাঁস, কুমড়ো আর আখ। ঠাকুমার পূজোও বাড়িতে। বলি হত আখ, চালকুমড়া। কুমড়ো দুটোর ওপর, আখ দুটোর উপর সিঁদুরের ফোঁটা দিত ঠাকুমা। তারপর বলি দিত কাকু। ঘন্টা শঙ্খ বাজত। অনেকে প্রসাদ খেতে আসত। কুমড়োর ফালি আখের টুকরো নিতে আসতে কেউ কেউ। বাবা আমাকে বোতলের ভেতর রাংতা, সোডা আরও কী সব গিয়ে গ্যাস বেলুন বানিয়ে দিতেন। আমি ওই বেলুন নিয়ে নাচঘরের কাছে দিয়ে আকাশে ছেড়ে দিতাম। ছাড়ার সময় আনন্দ হত। আবার যখন বেলুনটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে মিলিয়ে যেত তখন দুঃখও হত। দশমীর দিন মেয়ে বউরা খই ছিটাতো দুর্গার উপর। সিঁদুর দিত। আচমকা বন্ধুরা তখন দুর্গার চোখে, লক্ষ্মী সরস্বতীর চোখে জল দেখতাম। আমার চোখে কি জল আসত ? কে জানে ! কিন্তু মন খুব খারাপ হত। এত বিষাদ এত বিষাদ আহারে। প্রসেশনে যেতাম। আমার বাবা, ছোট ভাই কাঞ্চন, বিষ্ণুকাকু, মুরলীর বাবা সবাই যেতাম। বিসর্জনের পর ফিরে আসার পথে সবাই গাইতাম...

মাকে ভাসায়ে জলে
কি ধন লয়ে যায় ঘরে
ঘরে গিয়ে মা বলিব কারে...

তারপর মণ্ডপের ভেতর সবাই শান্তিজল নিতাম। প্রথমে কোলাকুলি এসব হত। মেলা তখনও মো মো করে চলত। বাড়িতে এসে দেখতাম আমার ঠাকুমাকে, বাবা-মাকে প্রণাম করতে এসেছে দলে দলে বাগানের মহিলা পুরুষ। আমার জন্য কতজন নিয়ে আসত মিঠাই আর কাচের চুড়ি। আমি কাচের চুড়ি পরি না, তখন তো চুড়িই পরতাম না। কিন্তু নানা রঙের কাচের চুড়ি এর ভাল লাগে আমার ওই সময় থেকেই পাঁচ মিনিট চুড়িগুলো হাতে পরেই খুলে রাখতাম। এক বাক্সে, হর বছর পাওয়া চুড়িগুলো জমাতাম। মাঝে মাঝে খুলে দেখতাম। এখনও কেউ কাচের চুড়ি দিলে সযত্নে তুলে রাখি, মাঝে মাঝে নেড়ে চেড়ে দেখি। আসলে ওই দশমীর স্মৃতির সঙ্গেই জড়িয়ে আছে আমার কাচের চুড়ির প্রীতিও।

কাল সকালেও অনেক লোকজন আসবে। কিন্তু সকালে নাচঘরের দিকে তাকালে মনটা কেমন হু হু করবে। আবার কবে আসবে পূজো ? এসব ভাবতে ভাবতে আনন্দ বিষাদে মাখামাখি হয়ে ওই শৈশব চলা বিসর্জনের রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়তাম। তাই সেই শৈশববেলা এখানকার এই পূজোর দিনগুলিতে এখনও আমাকে জাগিয়ে রাখে, কাঁদায়, ভাবায় হাসায়, আনন্দেও ভরিয়ে রাখে অনেক্ষণ।

<><><><><>

মামার দিল্লি যাত্রা

- অমিত রঞ্জন দাস -

(বর্তমান সময়ে দেশের বহু আলোচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বিজেপির এই নেতাকে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা মামা বলে সম্বোধন করে থাকেন। সেই মামা নাকি রাজ্য রাজনীতির পাঠ চুকিয়ে আগামীতে জাতীয় রাজনীতিতে পাড়ি দিতে চলেছেন। আদৌ কি মামা দিল্লি যাত্রা করছেন? আর সত্যিই যদি মামা দিল্লি যাত্রা করে থাকেন তাহলে কে হবে তার স্থলাভিষিক্ত? কে চালাবে রাজ্যপাট? এনিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন অমিত রঞ্জন দাস)

''মামা বুলেট লাগিব'' এই সংলাপ শুনলেই আর বলে দিতে হয় না কারা কার কাছে এই আবদার করছেন। উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনকারী ছাত্রীদের প্রথম বারের মতো স্কুটি উপহার দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ভাগ্নীদের স্কুটি উপহার দেওয়ার পর রাজ্যের হাজার হাজার ভাগ্নের পক্ষ থেকে দাবি উঠেছিল তাদেরকেও বুলেট দিতে হবে। এরপর থেকেই এ রাজ্যের অগনিত ছাত্রীর আদরের মামা উপাধি লাভ করেন ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ফলে দেশব্যাপী তিনি এখন মামা নামে পরিচিত। সেই মামা এখন জাতীয় মিডিয়ায় এক আলোচিত নাম। শুধু তাই নয়, তিনি খুব শীঘ্রই জাতীয় রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন বলেও রাজনৈতিক মহলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। আর তাই মামার দিল্লি যাত্রা এখন রাজ্য রাজনীতির বহু চর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে দেখতে দেখতে জালুকবাড়ির হিমন্ত বিশ্ব শর্মা একজন সফল রাজনীতিক হয়ে উঠার পেছনে রয়েছে তাঁর ঝুঁকিপূর্ণ রাজনীতি আর বহু কৌশলের খেলা। রাজনীতির ময়দানে কোন সময় কোথায় কিভাবে পাশার দান ফেলতে হয়, সেই কৌশলটা তিনি খুব ভালো করে রপ্ত করেছেন। আর সে কারণেই আজকের দিনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা হিসাবে যার নাম জাতীয় মিডিয়াতে চর্চিত হচ্ছে তিনি আর কেউ নন অবশ্যই অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে উত্তরপূর্বাঞ্চল থেকে এরকম কোন প্রভাবশালী নেতাকে জাতীয় রাজনীতিতে এত প্রভাব বিস্তার করতে আগে দেখা যায়নি। ড. হিমন্ত বিশ্ব শুধু যে

অসমের মুখ্যমন্ত্রী কিংবা ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এল্যায়েন্স (এন এ ডি এ) - র চেয়ারম্যান তা- কিন্তু নয়। বর্তমান সময়ে দেশের শাসকদল বিজেপির পাঁচজন প্রভাবশালী নেতার মধ্যে নিজের স্থান দখল করে নিতেও সক্ষম হয়েছেন এই বহুচর্চিত ব্যক্তি। অসমের সজ্জন রাজনীতিক এবং রাজ্যের একাধিকবারের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ-র হাত ধরে রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। তারপর দেখতে দেখতে রাজ্যের সর্বাধিক প্রভাবশালী মন্ত্রী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী গগৈয়ের বিশেষ আস্থাভাজন হয়েছিলেন তিনি। এমনকি একসময় বিরোধী দলে ভাংগন ধরিয়ে রাজ্যসভা নির্বাচনে বাজিমাত করেছিলেন অসম রাজনীতির এই চাণক্য। তারপরের কাহিনী আরও চমকপ্রদ। হঠাৎ এক ঝাঁক বিধায়ক নিয়ে কংগ্রেস শিবিরকে আলবিদা জানিয়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লিখান তুখোড় রাজনৈতিক শর্মা। তারপর দেখতে দেখতে সর্বানন্দ সানোয়াল মন্ত্রী সভায় একাধিক দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী হিসাবে নিজের দক্ষতা দেখাতে থাকেন। সফলতার সংগে অসমে সানোয়ালের নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার পাঁচবছর পূর্ণ করার পর ফের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় অসমে। এই নির্বাচনে ভোট প্রচারের প্রধান দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এরপর ২০২১ -র বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যগরিষ্ঠতা নিয়ে অসমে দ্বিতীয়বারের মত ক্ষমতা দখল করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোট। আর তখনই অসমের মানুষ দেখেন রাজনীতির আসল পাশাখেলা। অবিশ্বাস্যভাবে সর্বানন্দ সানোয়ালকে পিছনে ঠেলে অসমের মুখ্যমন্ত্রীর কুরসি দখল করেন তিনি।। তারপর আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। দেখতে দেখতে বিজেপির উত্তর পূর্বাঞ্চলের মুখ হয়ে উঠেন তিনি। শুধু তাই নয়, আজকের দিনে জাতীয় পর্যায়ে বিজেপির পঞ্চপান্ডবের একজন হিসাবে নিজের স্থান আদায় করে নিয়েছেন। একসময় কংগ্রেসের শক্তিশালী ঘাঁটি হিসাবে পরিচিত উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবক'টি রাজ্যকে এন ডি এ-র ছাতার নীচে আনার মুখ্য কারিগরের ভূমিকায় ছিলেন অসম রাজনীতির এই চাণক্য।

এখানেই শেষ নয়। বলা যায় এখান থেকেই শুরু। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে একের পর এক ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়ে সমগ্র দেশে আলাড়ন সৃষ্টি করে চলেছেন

এই ব্যতিক্রমি রাজনীতিক। এই রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের কাছে যার পরিচয় মামা। উচ্চতর মাধ্যমিকে ভালো ফলাফলকারী ছাত্রীদের (ভাগ্নীদের) বিনামূল্যে স্কুটি বিতরণ করে রীতিমতো হিরো হয়ে আছেন এই ডায়নমিক নেতা। অসমের পোড় খাওয়া মানুষ কৌতুক করে বলাবলি করেন যে, রাজনীতির পাশা খেলায় মহাভারতের মামাশ্রী শকুনিকেও হার মানাবার ক্ষমতা রাখেন অসমের এই মামা। কংগ্রেসের মন্ত্রী হিসাবে যিনি বিজেপি - আর এস এস-র সবচেয়ে বড় সমালোচনক ছিলেন সেই হিমন্ত বিশ্ব বিজেপিতে আসার পর বিজেপির নয়নের মনি হয়ে আছেন। পাশা পালটানোর খেলায় তিনি যে কতটুকু দক্ষ তার প্রমান পাওয়া যায় মামার হিন্দুত্ববাদী এজেন্ডায়। কংগ্রেসের মন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করতে গিয়ে যিনি চাঁচাছোলা ভাষায় বিজেপি - আর এস এস-কে তুলোধুনো করতেন সেই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজকের দিনে দেশের হিন্দুতবাদী রাজনীতির অন্যতম মুখ। ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এতদিনে এটা ভালো করে বোঝে গেছেন যে, রাজনীতিক হিসাবে তাকে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে গেরুয়া গালিচা দিয়েই এগুতে হবে। আর তাই তিনি সেই পথেই হাঁটছেন। দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণে এটা পরিষ্কার যে, সময়ের সংগে সংগে দেশে হিন্দুত্ববাদের প্রভাব বাড়ছে। তাই দিল্লির মসনদ যতই দূরের হোক না কেন গেরুয়া গালিচা দিয়ে হেঁটে সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো যে সম্ভব তা তিনি ভালো করে বুঝে গেছেন। তাই ধ্যেয়ো নিষ্ঠভাবে গেরুয়া পথকেই বেছে নিয়েছেন শর্মা। তিনি এটা খুব ভালো করে জানেন যে, বিজেপি এবং আর এস এস - র আরও ঘনিষ্ঠ হতে হলে তাকে কি করতে হবে। আর এক্ষেত্রে তিনি যোগী আদিত্য নাথের দেখানো পথকেই বেছে নিয়ে এগোচ্ছেন। তিনি তার কিছু কিছু কাজে যোগী মডেল প্রয়োগ করে ব্যাপক সাড়া ফেলে দিয়েছেন সমগ্র দেশে। আজকের দিনে দেশের যে কোনো রাজ্যের নির্বাচনে অসমের মুখ্যমন্ত্রীকে দলের হয়ে প্রচার চালাতে দেখা যায়। এদিকে নিজের রাজ্য অসমে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

একাধিক উগ্রবাদী সংগঠনকে জীবনের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনা, প্রশাসনিক কাজে গতি আনা, উন্নয়নমূলক উদ্যোগ স্থাপন, কেন্দ্র -রাজ্যের সম্পর্ককে আরও মধুর করা,রাজ্যের উন্নয়নে দিল্লির মনোযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক সহ সার্বিক সহযোগিতার বিষয়ে গুরুত্ব বাড়ানো, ব্যাপকহারে নিযুক্তি প্রদান, রাজ্যের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়ে রাজ্যের এক ব্যতিক্রমী মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে খ্যাতি অর্জন করেছেন। পাশাপাশি এই রাজ্যের মানুষের ভাষা ধর্ম কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সর্বোপরি রাজ্যবাসীর অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই একের পর পদক্ষেপ নিয়ে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে চলেছেন বহু চর্চিত এই নেতা। সত্রের ভূমি বেদখল মুক্ত করা,বাল্যবিবাহ বিরোধী অভিযান,বহু বিবাহ প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণ, দালাল বিরোধী অভিযান, বিহু নৃত্যকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়ে যাওয়া, গরু পাচার বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ, অরুণোদয় প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা সাবলিকরণের পদক্ষেপ, আত্মসহায়ক গোষ্ঠীকে আর্থিক সাহায্য, আদিবাসী এবং জনজাতিদের অস্তিত্ব রক্ষা, বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ রোখা, প্রতিবেশী রাজ্যের সংগে সীমা বিবাদের অবসান, কাজিরাঙ্গার একশিংগী গন্ডারের চোরাচালান রোধে সফলতা অর্জন, অসম তথা উত্তরপূর্বের প্রতি লগ্নিকারীদের আকর্ষিত করা, ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের ঋণ মুকুব ইত্যাদি গনমুখী গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহন করে রীতিমতো আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই উত্তরপূর্বকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন। বিভিন্ন কারনে কেন্দ্র সরকারের কাছে অসমের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এই রাজ্যকে উত্তর পূর্বের প্রবেশ পথ হিসাবে ধরা হয়। গোটা উত্তরপূর্বের উন্নয়নের প্রবেশ পথ হচ্ছে এই অসম। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিপুল সম্ভাবনা থাকার জন্য এই অঞ্চলের গুরুত্ব কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারের কাছে অনেক বেড়ে গেছে। আর তাই এ অঞ্চলে একজন শক্তসামর্থ নেতার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। ড. শর্মার মাধ্যমে কেন্দ্র সরকারের

সেই চাহিদা পূরণ হয়েছে বলে বিজ্ঞ মহল মনে করছেন। কেন্দ্র সরকার লোক ইস্ট পলিসিকে সামনে রেখে এ অঞ্চলের সার্বিক বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। আর তাই সব মিলিয়ে আজকের দিনে উত্তরপূর্বের রাজনীতির প্রধান মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছেন শর্মা। স্বাধীনতার পর উত্তর পূর্বের কোন নেতা প্রথমবারের মতে উত্তরপূর্বের গন্ডি পেরিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন। হয়তো চব্বিশের লোকসভা ভোটের পর কেন্দ্রের রাজনীতিতে দেখা যেতে পারে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে। এনিয়ে কানাঘুষো চলছে রাজ্য রাজনীতিতে। এমনকি যদি মামা সত্যিই দিল্লি যাত্রা করেন তাহলে তার স্থলাভিষিক্ত কে হতে পারেন এনিয়েও জোর চর্চা চলছে। যদিও যাবতীয় কিছু নির্ভর করছে লোকসভা নির্বাচনের উপর। আজকের দিনে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার যে ভাবে গুরুত্ব রয়েছে তাতে কেন্দ্রের বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী করা হতে পারে বলে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছে। শুধু তাই নয়, হিমন্ত ঘনিষ্ঠ মহল মামার দিল্লি যাত্রা নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। আবার এমনও শোনা যাচ্ছে যে, ছাব্বিশের অসম বিধানসভা নির্বাচন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বেই হবে এবং তারপর হয়তো তিনি কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে চলে যেতে পারেন। আর তাই মামার দিল্লি যাত্রার প্রসঙ্গটিই আজকের দিনে অসমের বহু চর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এনিয়ে অনেক কথাই উঠে আসছে চর্চায়। আজকের সময় আলোচনায় ঘুরপাক খাওয়া লক্ষ টাকার প্রশ্ন হচ্ছে সত্যেই যদি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্য রাজনীতিকে গুডবাই জানিয়ে দিল্লি যাত্রা করেন তাহলে তার আসনে কে বসবে অথবা কাদের বসার সম্ভাবনা রয়েছে। এনিয়ে রাজ্যরাজনীতিতে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে। কারন নিজের হাতে গড়া মসনদ খুব সহজে যার তার হাতে তুলে দেওয়ার পাত্র নন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ফলে সত্যেই যদি মামা দিল্লি যাত্রা করেন তাহলে অসমের রাজ্যপাট কে সামলাতে পারেন? এক্ষেত্রে ড. শর্মার একান্ত আপনজন কে? কার হাতে নিজের সাম্রাজ্য তুলে দিতে পারেন হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এনিয়ে বিস্তর আলোচনা চললেও মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে চাইছেন না। আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে যেহেতু হিমন্ত বিশ্ব তাই তাঁর পক্ষে অনেক কিছুই সম্ভব। ফলে যদি শেষমেশ মামা দিল্লিভিমুখে যাত্রা করেন তাহলে অবশ্যই তার অতি ঘনিষ্ট কেউ একজন দিসপুরের সিংহাসন সামলাবেন। নিজ রাজ্যের কর্তিত্ব কোন অবস্থায় হাতছাড়া হতে দিতে চাইবেন না চাণক্য হিমন্ত। কারন রাজনীতির প্রথম শর্তই হচ্ছে জমির দখলদারি অব্যাহত রাখা। আর রাজনীতি ব্যাপারটা খুব ভালো করেই বোঝেন ডক্টর শর্মা। সবকিছুর পর মোদ্দা কথা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী শর্মার উত্তরসুরী কে হতে চলেছেন? তিনি কি মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত ঘনিষ্ঠ দুই লেফটেন্যান্ট -র একজন না অন্য কেউ? উত্তর দেবে সময়। ফলে অসমের মানুষকে সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে। এখন দেখতে হবে মামা সত্যিই দিল্লি যাত্রা করছেন, না মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তরুণ গগৈর রেকর্ড ভংগ করতে চলেছেন।

<><><><>

শুভ শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারনকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও অভিনন্দন।

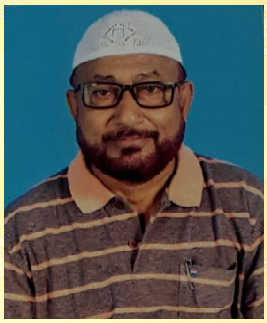

মনোয়ার হুসেন চৌধুরী
(সেলিম)
কোষাধ্যক্ষ
লায়ন্স ক্লাব অব লালা
চন্দ্রপুর ২য় খণ্ড, লালা, হাইলাকান্দি

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ড. সুব্রত দে
ইনচার্জ,
কাটলিছড়া বস্নক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র

বিশেষ প্রতিবেদন

মুখ্যমন্ত্রীর মর্জিতেই করিমগঞ্জ লোকসভা

- চন্দন কুমার রায়-

সাম্প্রতিক ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়ায় করিমগঞ্জ লোকসভা তফশিলি সংরক্ষণ মুক্ত হওয়ায় সাধারণ ক্যাটাগরির মানুষের মধ্যে এই আসন নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে করিমগঞ্জ লোকসভা আসন নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো এই লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পেয়েছেন সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। এমনকি হিন্দু সম্প্রদায়ের যারা সাধারণ ক্যাটাগরির তারাও দীর্ঘদিন পর করিমগঞ্জ লোকসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে যেহেতু মুসলিম ভোটারের সংখ্যা বেশি, তাই এই আসন নিয়ে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে অধিক উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর তাই, রাজনৈতিক দলগুলিকেও এই আসনে জয়ের রণকৌশল নতুনভাবে রচনা করতে হচ্ছে। করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলা মিলিয়ে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে হিন্দু ভোটের চেয়ে মুসলিম প্রায় পৌনে দুলক্ষ ভোট বেশি আছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। এজন্যই এবার নতুন রণকৌশল হাতে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলিকে ভোটযুদ্ধে নামতে হচ্ছে। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার রাজ্যের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল করিমগঞ্জে মোটামুটি স্পষ্ট রণকৌশল নিয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হচ্ছে। যেমন বিজেপি, হারা-জেতা পরের কথা, এই রাজনৈতিক দলটি হিন্দু প্রার্থীকেই মনোনয়ন দেবে। এ বিষয়ে কোনও সংশয় থাকতে পারে না। এখন পর্যন্ত দলীয় সূত্রে যে সব খবর পাওয়া গেছে, তাতে মনে হচ্ছে স্থানীয় প্রার্থীকেই দল মনোনয়ন দেবে। আপাতত এই আসনে প্রাক্তনমন্ত্রী গৌতম রায়, এএসটিসি চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, প্রদেশ বিজেপির নেতা বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য, মহিলা নেত্রী শিপ্রা গুণ, অসম প্রদেশ বিজেপির তপশিলি মোর্চার সভাপতি মুন স্বর্নকার, হাইলাকান্দি জেলা বিজেপির সভাপতি স্বপন ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম নিয়ে চর্চা চলছে। যদিও প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায় লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইচ্ছুক নন।

এমনকি করিমগঞ্জ আসনে বিজেপি প্রার্থীত্বের দৌড়ে তিনি নেই বলে নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন। বরং নতুন প্রজন্মকে জায়গা ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি। ভোটে লড়াইয়ের তেমন কোন ইচ্ছেই নেই তাঁর। গৌতম রায় যুক্তি দেখিয়ে বলেন, রাজনৈতিক জীবনের পরিপূর্ণতা ইতিমধ্যে লাভ করেছেন তিনি। কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের জনগণের আশির্বাদে ছয়বার বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পাশাপাশি চারবার মন্ত্রী হয়েছেন। লাকসভা নির্বাচনে বিজেপি দল যাকেই প্রার্থী করবে তার জয় নিশ্চিত করতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। তবে এক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের কাউকে প্রার্থীত্ব দেওয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি। অন্যদিকে মিশনরঞ্জন দাস ঘনিষ্ঠ মহলে বলেছেন তিনি নিজে থেকে মনোনয়ন চাইবেন না, দল যদি তাকে প্রার্থী করে তা হলে অন্য কথা। এক্ষেত্রেও যদি আছে। বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে মিশনরঞ্জন দাসের সম্পর্ক তেমন ভাল নয়। তাই তাকে প্রার্থী করা হবে কিনা, এ ব্যাপারে সংশয় রয়েছে। বাকি নামগুলিও মুখ্যমন্ত্রীর মর্জির ওপরই নির্ভর করবে। শুধু প্রার্থী বাছাই-ই নয়, বিজেপি কর্মীদের মতে, দলের প্রার্থী এই আসনে জয়ের জন্য লড়বে, না হারার জন্য- সেটাও নির্ভর করবে হিমন্তবিশ্ব শর্মার মর্জির ওপর। তিনি যদি এই আসনে বিজেপিকে জয়ী করতে মনস্থির করে ফেলেন, তা হলে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের লড়াইয়ের চিত্র অনেকটাই বদলে যাবে বলে বিরাট সংখ্যক বিজেপি কর্মীদের ধারণা। এদিকে গোপন সূত্রের খবর হচ্ছে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে সংঘের পছন্দের প্রার্থীকে বিজেপির টিকেট দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই একজন প্রাক্তন সংঘ কার্যকর্তার নাম নিয়ে আলোচনা চলার খবর পাওয়া গেছে। খুব শীঘ্রই সংঘের এই প্রাক্তন কার্যকর্তা জনসংযোগের কাজে নামবেন বলেও জানা গেছে। যারফলে করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে শেষমেশ কার ভাগ্যে বিজেপির টিকেট জুটবে এখনই হলফ করে বলা যাচ্ছে না। ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া নিয়ে বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের বিরাট অংশ মুখ্যমন্ত্রীর ওপর ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ। যেভাবে আসন ও এলাকা কাটছাঁট করা হয়েছে, এরমধ্যে তারা মুখ্যমন্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতা দেখতে পাচ্ছেন। অনেকেই মনে করেন করিমগঞ্জ লোকসভা আসনটি বদরুদ্দিন আজমলকে উপহার দেওয়ার জন্যই তফশিলি সংরক্ষণ তুলে

নেওয়া হয়েছে। যদি সত্যি-ই তাই হয়, তা হলে এই আসনে বিজেপি লড়ার কোনও অর্থ নেই। অবশ্য, অনেকেই একথাও মনে করেন, অসমের ১৪টি লোকসভা আসনের মধ্যে যদি ১০-১২টি আসনে বিজেপির অবস্থা ভাল থাকে, তা হলে করিমগঞ্জ ও ধুবড়ি আসন দখল করতে তেমন জোর লাগাবে না শাসক দল। এমনকী অগপকে আসনটি ছেড়ে দিতে পারে। এআইইউডিএফের জেতার রাস্তা পরিষ্কার করা হবে। তবে অন্যসূত্রের খবর অগপ এখানে শক্ত প্রার্থীর সন্ধানে রয়েছে। এক্ষেত্রে ই.আর.ডি.এফ. ফাউন্ডেশনের কর্ণধার তথা মেঘালয়ের ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্সের ভাইস চেন্সেলর মেহবুবুল হককে প্রার্থী করার তৎপরতা চলেছে। পাথারকান্দির বাসিন্দা মেহবুবুল হকের সঙ্গে মূখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। ফলে মুসলিম অধ্যুষিত ওই আসনে উত্তরপূর্বের ব্যক্তিগত শিক্ষা খণ্ডের অন্যতম মুখ মেহবুবুল হককে প্রার্থী করে এক ঢিলে দুই পাখি মারতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। আর যদি অসমে বিজেপির অবস্থা ভাল না হয়, তাহলে মুখ্যমন্ত্রীকে করিমগঞ্জ আসনেও মনোনিবেশ করতে হবে।এই আসনে জয়ী হতে তাকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। বিজেপির আরেক অংশ মনে করেন, মুখ্যমন্ত্রী ঝুঁকি নিতে যাবেন না। এআইইউডিএফ প্রকাশ্যে বিজেপিকে সমর্থন করতে যাবে না, কংগ্রেসকেই করবে, তাই এই আসনটি বদরুদ্দিন আজমলকে উপহার দিয়ে বিজেপির কোনও লাভ হবে না। মুখ্যমন্ত্রী করিমগঞ্জ বিজেপি নেতাদের আশ্বাস দিয়েছেন এই আসনে দলীয় প্রার্থীর জেতার সম্ভাবনা আছে এবং দল এখানে জয়ী হতে পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করবে। অন্যদিকে বিজেপির সংঘ ঘনিষ্ঠ নেতারা অবশ্য এই আসনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে লড়াইয়ে নামার পক্ষপাতী। এখন দেখার পালা কোথাকার জল কোথায় গড়ায়।

করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে ভোট যুদ্ধ কী রূপ ধারণ করবে, তা অনেকটাই নির্ভর করবে মুখ্যমন্ত্রীর মর্জি এবং বিজেপির পলিটিক্যাল পলিসির উপর। এদিকে করিমগঞ্জ লোকসভা আসন নিয়ে কংগ্রেসের রণকৌশল অনেকটাই পরিষ্কার। তারা মুসলিম প্রার্থীকেই দাঁড় করাবে। দলীয় সূত্রের খবর, এখন পর্যন্ত এই কেন্দ্রের কংগ্রেসের সম্ভাব্য প্রার্থী বিশিষ্ট আইনজীবী হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীর নাম নিয়ে সর্বাধিক চর্চা চলছে। এ ছাড়া অন্যান্য আরও অনেকের নাম নিয়েও বাজারে আলোচনা চলছে। কংগ্রেসের টিকিটের দৌড়ে সক্রিয় রয়েছেন বরাকের বিশিষ্ট অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডা: সামসুর রহমান লস্কর, অবসরপ্রাপ্ত বনকর্তা সলমন উদ্দিন চৌধুরী। তবে

করিমগঞ্জ আসনে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের পছন্দ মত প্রার্থী দাঁড় করানো হবে বলেও বাজারে চর্চা চলছে।।আর তার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হাফিজ রশিদ আহমদ চৌধুরীকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে হাইলাকান্দি কংগ্রেস কমলাক্ষর প্রার্থীকে মেনে নেবে কি-না। এর উপর হাফিজ রসিদের প্রার্থী হওয়া না হওয়া অনেকটাই নির্ভর করবে। করিমগঞ্জ আসন নিয়ে এআইইউডিএফের রণকৌশল এখনও স্পষ্ট নয়। বিজেপি ও কংগ্রেস কী করে, সেদিকে তাদের চোখ। বিভিন্ন মহলের খবর, বদরুদ্দিন আজমলের সঙ্গে হাফিজ রসিদের সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে ভাল চলছে না । তিনি কি চাইবেন হাফিজ সাংসদ নির্বাচিত হোন? এটা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তাই এখানে বদরুদ্দিন আজমল শক্ত প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেন। এ আই ইউ ডি এফ -র প্রার্থী হিসেবে ইতিমধ্যেই কিছু নাম নিয়ে চর্চা চলার খবর পাওয়া গেছে। এর মধ্যে রয়েছেন আজমল ভ্রাতা যমুনামুখের বিধায়ক সিরাজ উদ্দিন আজমল, শিক্ষাবিদ কে এম বাহারুল ইসলামের মতো ব্যক্তিত্ব। সেক্ষেত্রে লড়াই অনেকটাই আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে। করিমগঞ্জ আসনের চিত্র বদলে যাবে। অবশ্য অনেকেই মনে করেন, এমনিতেই বদরুদ্দিন আজমল করিমগঞ্জ লোকসভা আসনে লড়াইয়ের চিত্র বদল করার ক্ষমতা রাখেন। করিমগঞ্জে সাধারণ খেটে খাওয়া, কৃষিজীবী মুসলিমদের মধ্যে তার প্রভাব এখনও অটুট। কিন্তু হাইলাকান্দির মুসলিমরা কী করেন, তার উপর এআইইউডিএফের অনেক কিছু নির্ভর করবে। এমন কথাও শোনা যাচ্ছে, এআইইউডিএফ হিন্দু প্রার্থীও দাঁড় করাতে পারে। পরিস্থিতি বুঝে তারা পদক্ষেপ নেবেন। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার মতো বদরুদ্দিন আজমল যদি করিমগঞ্জ আসনে জয়ী হতে কোমর কষে লড়াইয়ে নেমে পড়েন, তা হলে কোনও সংশয় নেই, ভোটযুদ্ধ আকর্ষণীয় হবেই। কংগ্রেস প্রধানত মুসলিম ভোট এবং কিছু হিন্দু ভোটকে পুঁজি করে লড়াইয়ে নামবে। অন্যদিকে অসম বিজেপির উপর বরাকের হিন্দুরা নানা কারণে অসন্তুষ্ট হলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি সমর্থন রয়েছে। কম করেও পঁচাশি শতাংশ হিন্দু ভোট শাসক দলের পক্ষে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বিজেপির যে জয়ের সম্ভাবনা নেই, তা কিন্তু নিশ্চিত হয়ে কেউ বলতে পারছেন না। এআইইউডিএফ স্বাভাবিকভাবেই মুসলিম ভোটের ওপরই নির্ভর করছে। হিন্দু প্রার্থী দিলে কী হবে, তা বুঝতে একটু সময় লাগবে। মোট কথা, হিমন্তবিশ্ব শর্মা ও বদরুদ্দিন আজমল করিমগঞ্জ লোকসভা আসনের লড়াইয়ে কী রণকৌশল নেন, সেটার ওপর নির্ভর করবে এই আসনের লড়াইয়ের চিত্র।

<><><><><>

ডিলিমিটেশন : এক আসন তিন বিধায়ক

- জুয়েল আহমদ -

অসমের লোক সভা ও বিধানসভার সীমানা পুনঃ নির্ধারণ সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর এতে ইতিমধ্যে সিলমোহর পড়েছে দেশের রাষ্ট্রপতির। ফলে আগামী লোকসভা ও বিধানসভা ভোট যে নতুন ডিলিমিটেশন অনুযায়ী হবে তা প্রায় নিশ্চিত। এই ডিলিমিটেশন হাইলাকান্দির জন্য আপাত দৃষ্টিতে কোন সুখবর বয়ে নিয়ে আনতে পারেনি।বরং জেলার তিন বিধানসভা আসনের মধ্যে একটি আসন বাদ পড়ে। দুটি বিধানসভা আসন অর্থাৎ আলগাপুর-কাটলিছড়াও হাইলাকান্দি আসনের উপর সিলমোহর পড়ে নির্বাচন কমিশনের। সান্ত্বনা হিসাবে আলগাপুরের সঙ্গে কাটলিছড়ার নাম জুড়ে দিলেও সংখ্যার বিচারে বিধানসভা তিন থেকে কমে দুই করা হয়েছে। জেলার একটি আসন কম হওয়া মানে সার্বিক উন্নয়ন মার খাওয়া।

এই ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে জেলার মানুষের রাজনৈতিক অধিকার যেমন খর্ব করা হয়েছে তেমনি বিধান সভায় জেলার প্রতিনিধিত্ব মার খাবে। এছাড়া বিধানসভার নিরিখে হলে বিধায়ক তহবিল বরাদ্দ থেকে শুরু অন্যান্য খাতে যে সব প্রকল্পে টাকা দেওয়া হবে এর থেকে হাইলাকান্দি জেলা যে বঞ্চিত থাকবে তা নিশ্চিত। তবে এর পরও ডিলিমেটেশনে হাইলাকান্দি জেলাকে যে দু ভাগে ভাগ করা হয়েছে এতে এক আসন সংখ্যালঘু ও এক আসন সংখ্যাগুরু অধ্যুষিত হয়ে পড়েছে। একটু স্পষ্ট করে বললে,চুড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর দেখা গেছে হাইলাকান্দি ও আলগাপুর-কাটলিছড়া বিধানসভা আসনে সাম্প্রদায়িক বিভাজন স্পষ্ট। হাইলাকান্দি আসনে যেসব জিপি- গ্রাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এর ৯৯ শতাংশই হিন্দু সম্প্রদায়ের।আর আলগাপুর- কাটলিছড়া আসনে একই ভাবে মুসলিম অধ্যুষিত বেশিরভাগ এলাকা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় ভোটের ময়দানে হাইলাকান্দি জেলায় নতুন করে আর মেরু বিভাজন হবে না। যা করার তা ডিলিমিটেশন আগেভাগে করে দিয়েছে বলে অনেকেই মনে করছেন। এই প্রেক্ষাপটে আগামী বিধানসভা ভোটে শাসক দলের টিকিট ডিলিমিটেশন পরবর্তী হাইলাকান্দি আসনে পেতে বিজেপি নেতাদের দীর্ঘ লাইন থাকবে একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

আর এতেই সংখ্যাগুরুদের সব ভোট তাদের পক্ষে যাবে ধরে নিয়ে অনেকটা খুশি শাসক দল।কারণ ডিলিমিটেশনের পর নতুন হাইলাকান্দি বিধানসভা আসন যেটি হয়েছে সেটির জনভিত্তির নিরিখে বিজেপি তাদের প্রার্থী জিতিয়ে আনতে পারবে বলে আশাবাদী।বর্তমান হাইলাকান্দি বিধানসভা আসন থেকে ১৯৯১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রথম ও শেষবারের মতো বিজেপির বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন চিত্তেন্দ্র নাথ মজুমদার।এরপর হাইলাকান্দির তিন আসনে আর খাতা খুলতে পারেনি শাসক দল। ফলে দীর্ঘ ৩৫ বছরের খরা কাটিয়ে জেলার এক আসন বিজেপি দখল করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ায় শাসক দল বেজায় খুশি।

অপরদিকে জেলার তিন আসন কমে দুই এবং আসনগুলিতে যে জনবিন্যাস স্পষ্ট হয়েছে এতে জেলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও এআইইউডিএফ দলের তিন বিধায়ক সবচেয়ে বিপাকে পড়েছেন। তিন বিধায়কে আলগাপুর-কাটলিছড়া আসনে ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ছাড়া বিকল্প নেই।ওই আসনটি পুরোপুরি মুসলিম অধ্যুষিত হওয়ায় এখানে এআইউডিএফ ও কংগ্রেস দলের টিকিট পেতে মুসলিম প্রার্থীদের দৌড় তুঙ্গে উঠবে একথা নিশ্চিত। সবচেয়ে বড় কথা হল জেলার বর্তমান আজমলের দলের তিন বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্কর, নিজাম উদ্দিন চৌধুরী ও জাকির হোসেন লস্করের রাজনৈতিক ভবিষৎ কি হবে এনিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। এর মধ্যে জাকির হোসেন লস্করের বর্তমান বিধানসভা হাইলাকান্দির

নাম ডিলিমিটেশনে থাকলেও গোটা আসনের খোলনলচা বদলেগেছে। ফলে ওই আসনে ফের দলীয় টিকিটের দাবিদার তিনি কি হবেন এই প্রশ্নও দেখা দিয়েছে।এদিকে সুজাম- নিজামের ক্ষেত্রে আরো জঠিল পরিস্থিতি। দুজনে মিলে এক আসন

আলগাপুর-কাটলিছড়া।এখানে আবার রয়েছে বর্তমান হাইলাকান্দি আসনের বেশ কিছু সংখ্যালঘু গ্রাম। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য হচ্ছে দলতো নির্বাচনে একজনকে প্রার্থী করবে। এক্ষেত্রে তালাচাবি কার ভাগ্যে জুটে তা নিয়েই চর্চা শুরু হয়েছে। এছাড়া ২০২৬ পর্যন্ত আজমলের ঘনিষ্ঠ কোন বিধয়ক থাকবেন? এও এক প্রশ্ন। এই প্রেক্ষাপটে তিন বিধায়কের সমর্থকরা নিজেদের দখলে থাকা বর্তমান বিধানসভা এলাকার বেশি এলাকা আলগাপুর-কাটলিছড়া আসনে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে এনিয়ে হিসেব নিকেশ শুরু করে দিয়েছেন। তবে ওই বিধানসভা এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বর্তমান কাটলিছড়া বিধানসভা এলাকার বেশিরভাগ সংখ্যালঘু এলাকা ওই বিধানসভায় রয়েছে।ফলে আধিপত্যের নিরিখে ওই আসনে দলের টিকিট পেতে আজমলের দলের বিধায়করা যে আগামীতে তদ্বির চালাবেন তা এখনই আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। নিজাম- সুজাম ইতিমধ্যে কাটলিছড়া - আলগাপুর থেকে নিজেদের সমর্থক জোগাড়ের প্রতিযোগিতায় নামতে ইদানিং দেখা গেছে। এর মধ্যে সুজাম উদ্দিন লস্কর কিছুটা মেপেজোঁকে আলগাপুরে পা রাখতে চাইলেও নিজাম

উদ্দিন চৌধুরী রীতিমতো টি টুয়েন্টি মুডে রয়েছেন।তবে এই প্রতিযোগিতা থেকে নিজেকে এখনো কিছুটা আলগে রেখেছেন বিধায়ক জাকির হোসেন লস্কর। এক্ষেত্রে সার্বিক বিবেচনায় নিজের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিধায়ক সুজাম উদ্দিন লস্কর আলগাপুর - কাটলিছড়া আসনে শেষমেশ কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে আসলেও আশ্চর্যের কিছু থাকবে না বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

<><><><><>

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে
জানায় আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
শারদীয় দুর্গোৎসব সবার জীবনে সুখ, শান্তি নিয়ে আসুক এই শুভ কামনায় -
রাধা গোপীনাথ জুয়েলার্স
RADHA GOPINATH JEWELLERS

N.N. Dutta Road, Silchar, Assam
Call : 03842 - 246 628

বিশ্বাসীরাই প্রকৃত প্রগতিশীল

- বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল -

বিশ্ব এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। প্রকৃতি এখন মানুষের নিয়ন্ত্রণে। বর্তমানে পৃথিবী পরিণত হয়েছে একটি গ্রামে নয়, একটি পরিবারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে মানুষ এখন পৃথিবী ছেড়ে মহাশূন্যেও নিজেদের আধিপত্য বিস্তারে ব্যস্ত। এমতাবস্থায় অতীত দিনের বিশ্বাস ও ধ্যানধারণায় পরিবর্তন আসা খুবই স্বাভাবিক। মানবজীবনের স্বরূপ, তার কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন এবং বিশ্বে মানুষের প্রকৃত মর্যাদা নির্ধারণে মানুষের চিন্তা-ভাবনা বারবার পরিবর্তিত রূপ গ্রহণ করে। তাই বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে মানুষ তার নিজস্ব গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাস নতুন কোনো বিষয় নয়। প্রাক-ঐতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষের এ বিশ্বাস চলে আসছে। শিল্প বিপ্লব ও রেনেসাঁর ফলে বিশ্ব যখন নতুন মোড় নিতে শুরু করে তখনই এ প্রশ্ন দেখা দেয় যে, স্রষ্টার বিশ্বাস মানবজীবনের অগ্রগতি ও উন্নয়নে কতটুকু সহায়ক। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে হলে প্রথমেই দেখা দরকার উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্যে কি প্রয়োজন এবং তা কিভাবে অর্জিত হতে পারে?

প্রগতিপ্রাণ অর্জনে দৃঢ় মানসিকতা

মানুষকে অগ্রগতির পথে চালিত করে তার দৃঢ় মানসিকতা। যে ব্যক্তি সর্বদা সংশয় ও সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে তার পক্ষে কঠিন কোনো পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয় না। তাছাড়া যেকোনো কর্মতৎপরতায় সাময়িক ব্যর্থতা আসতে পারে। তা সত্ত্বেও নিজ পদক্ষেপে দৃঢ় ও অবিচল থাকা গতিশীলতার লক্ষণ। সম্মুখে চলতে হলে যেকোনো বাধা অতিক্রম করার মনোভাব থাকতে হয়। একজন আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তির মধ্যেই এরূপ দৃঢ়তা আসতে পারে। সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসের কারণে সে পৃথিবীর কোনো শক্তিকেই ভয় পায় না। তাঁর উপর ভরসা করে সে যেকোনো কঠিন পদক্ষেপ নিতে পারে। যেহেতু সাফল্য নির্ভর করে সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছের উপর, তাই সাময়িক ব্যর্থতায় সে সাহসহারা হয় না। স্বীয় বিশ্বাসে সে সম্মুখপানে এগিয়ে চলে সাহসের সঙ্গে।

দৃঢ়তা ভারসাম্যের পরিপন্থী নয়।

কোনো পারফেক্ট ব্যক্তি নিজ কর্মে ও বক্তব্যে ভারসাম্য হারায় না। দৃঢ়তার নামে সে কোনো নীতিকে অতিক্রম করতে পারে না। কারণ জবাবদিহিতার চিন্তা তাকে সীমালংঘন করার মানসিকতায় বাধ সাধে। নিজ জীবনের অগ্রগতি সাধন করতে গিয়ে সে অন্যের অনিষ্টের কথা চিন্তা করতে পারে না। পার্থিব উন্নতির জন্যে শত প্রচেষ্টায় লিপ্ত থেকেও সে অনন্তজীবন কল্যাণের কথা স্মরণ রাখে। তার চরিত্রের দৃঢ়তা তাকে নীতির উপর অটল রাখে।

চরিত্র মানসিকতার পরিচায়ক

মানুষের মূল্য নির্ধারিত হয় তার চরিত্রের বিচারে। উন্নত চরিত্রের লোকই সমাজের প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে। উন্নত চরিত্র বিশ্বাসীর পরিচয়। **মহানবী (সা.) বলেন, 'সর্বোত্তম চরিত্র বিশিষ্ট ব্যক্তিই সবচেয়ে পূর্ণ বিশ্বাসের অধিকারী।' চরিত্র দ্বারা মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, যার মনোভাব যেরূপ, তার চালচলন ও জীবনধারা সেরূপই হয়ে থাকে।** যে ব্যক্তি স্বচ্ছ মনের অধিকারী তার ক্রিয়াকলাপে-এর স্বচ্ছতা ফুটে ওঠে। মানুষের প্রতি ভালোবাসা যার অন্তরে বদ্ধমূল থাকে, সে কাউকে কষ্ট দিতে পারে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ভোগবাদী চিন্তাধারায় চালিত হয়, তার প্রবণতা থাকে শুধুমাত্র আত্মতুষ্টি। জগতের সবাই গোল্লায় গেলেও সে নির্বিকার থাকতে পারে। **মূলত মানসিক প্রবণতাই মানুষকে সৎ কিংবা অসৎ কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কর্মই চরিত্রের চিত্র আর চরিত্র মানসিকতার দর্পণ।**

বিশ্বাস চরিত্র নির্ধারণ করে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তির চরিত্র হয় নির্মল। বিশ্বাস তাকে উন্নত জীবনের দিশা দান করে। সব রকমের অনর্থক ও অকল্যাণকর ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত রাখতে বিশ্বাসের কোনো বিকল্প নেই। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি জীবনে অবিশ্বাসী, তার চরিত্র কখনই উন্নত হতে পারে না। মায়া-মমতা, করুণা, পরোপকার তার দৃষ্টিতে অনর্থক। প্রগতির সংজ্ঞা এখানে এসে পরিবর্তিত হয়ে যায়। জনকল্যাণ হবে প্রগতির পরিপন্থী। বিশ্বাসের কারণেই তার কর্মে গতি সঞ্চারিত হয়। জাগতিক কিংবা অলৌকিক জীবনবোধ মানুষকে তার চরিত্র গঠনে সাহায্য করে। চরিত্র গঠনের জন্যে বিশ্বাস হলো পূর্বশর্ত।

অবিশ্বাসীরা ভীরূ

মধ্যসাগরে যখন তুফান ওঠে, তখন পারফেক্ট ব্যক্তিই অবিচল থাকতে পারে। বিশ্বাসহীনরা নয়। পারফেক্ট ম্যান জানে, আল্লাহর পক্ষ থেকেই সবকিছুর সিদ্ধান্ত হয়। অতএব তিনিই রক্ষা করতে পারেন। অবিশ্বাসীরা এ সময় কোনো কূল-কিনারা খুঁজে পায় না। তাই তারা জীবনের প্রতি নিরাশ হয়ে পড়ে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এরূপ নৈরাশ্য অগ্রগতির সহায়ক হতে পারে না। অন্যদিকে একজন বিশ্বাসী সবসময় আশাবাদী হয়ে থাকে। ফলে যেকোন বিপদে সে ধৈর্য ধারণ করে নিজ কর্তব্য কর্মে লিপ্ত থাকে। উন্নয়ন ও

অগ্রগতির জন্যে যে দৃঢ়তা ও অবিচলতা প্রয়োজন তা বিশ্বাসীদের জীবনেই পাওয়া যায়। **যে ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে না, অনন্তকাল মানে না, সে কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক লাভ-টিই বুঝে থাকে। তাই বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করা তার চরিত্রের পরিপন্থী।** অথচ পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রথম শর্তই হলো ধৈর্যধারণ করা।

প্রগতির চাপ

পৃথিবীর বস্তুসমূহের প্রকৃত মালিক সৃষ্টিকর্তা। মানুষ তার প্রতিনিধি মাত্র। কেবল সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মোতাবেকই সে তার ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু প্রগতিবাদীরা স্রষ্টার মৌল মালিকানার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে এবং মানুষকেই আসল মালিক বিবেচনা করে। স্রষ্টা সম্পর্কিত ধারণাকে একেবারে পরিত্যাগ করার ফলে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার মনোভাবও তাদের নেই। তাই তারা হয়ে ওঠে আত্মপূজারী। চিন্তা ও কর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়। তাদের অশুভ চিন্তা ও অসৎকর্মের ফলেই বিজ্ঞান পরিণত হয় মানুষের ধ্বংসের হাতিয়ারে। তারা নৈতিকতার পরিবর্তে আত্মপূজা, প্রদর্শনেচ্ছা, অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে বেছে নেয়। অর্থ ব্যবস্থার উপর চাপিয়ে দেয় স্বার্থপরতা ও প্রবঞ্চনার বোঝা। সমাজ জীবনে বিলাসপ্রিয়তা ও আত্মকেন্দ্রিকতার মারাত্মক বিষ ছড়িয়ে পড়ে। রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা, বর্ণ ও গোত্রের পার্থক্য এবং শক্তিপূজার দুষ্ট তীর বিঁধে মানবতার পক্ষে নিকৃষ্টতম এক অভিশাপ নেমে আসে। ফলকথা, তথাকথিত প্রগতিবাদ মূলত এক বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে যা কৃষ্টি ও সভ্যতার এক বিরাট মহীরূহে পরিণত হয়। সে বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে তা দূষিত। তার ফুল দেখতে সুন্দর হলেও তাতে রয়েছে কাঁটা। তার শাখা-প্রশাখায় শোভাবর্ধন করলেও তা থেকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তা অত্যন্ত বিষাক্ত এবং তার প্রভাবে গোটা মানবতা আস্তে আস্তে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায়।

প্রগতিবাদের প্রবক্তারাই এখন নিজেদের দর্শনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ। কারণ এতে জীবনের প্রতিটি বিভাগ ও ক্ষেত্রে এমন বিভ্রান্তি, জটিলতা ও অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে যে, তা সমাধানের কোনো উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বরং এক জটিলতা দূর করার প্রচেষ্টা থেকে অসংখ্য নতুন জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। তারা পুঁজিবাদের অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সমাজবাদের আবিষ্কার করলো। কিন্তু তা থেকে জন্ম নিলো মানবতার আরেক শত্রু কম্যুনিজম। গণতন্ত্রের বিকল্প অনুসন্ধান করতে গিয়ে তারা একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব ঘটালো। সামাজিক সমস্যাবলির সমাধান করতে গিয়ে তারা যে পদক্ষেপ নেয়, তা থেকে আত্মপ্রকাশ ঘটে নারীত্ববাদের। নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা প্রতিকারের জন্যে কোনো আইন করলে আইনলংঘন ও অপরাধপ্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মোটকথা, কৃষ্টি ও সভ্যতার নামে এমন এক বিষবৃক্ষ জন্ম নিয়েছে যা থেকে বিকৃতি ও বিশৃঙ্খলার দূষিত বায়ু প্রবাহিত হয়ে মানবজীবনকে দুঃখকষ্টের অন্তহীন গহ্বরে নিক্ষেপ করে। মানব সমাজের প্রতিটি অংশ তাকে তাতে জর্জরিত করে।

প্রগতিবাদীরা এখন নিজেদেরই অর্জিত ব্যাধির যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। তারা এখনো উদ্বেল। কোনো অমৃতরসের সন্ধানে তারা ছটফট করছে। কিন্তু সে অমৃতরসের উৎস তাদের জানা নেই। তাই নিজেদের ক্যান্সারদুষ্ট দর্শনকে মলম লাগিয়ে নিরাময়ের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। নিজেদের দর্শনের মৌলিক দুর্বলতা ও অনিষ্ট তাদের অনেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কিন্তু যেহেতু তারা কয়েক শতাব্দী ধরে ওই ভাবধারায় গড়ে উঠেছেন সেজন্যে তাদের মন-মগজে বিকল্প উৎসের কোনো ধারণাই আসে না। তারা অত্যন্ত ব্যাকুলতার সঙ্গে তাদের যন্ত্রণা উপশমকারী কোনো জিনিসের সন্ধান করছে। কিন্তু তাদের অভীষ্ট বস্তুটি কী এবং তা কোথায় পাওয়া যাবে–এ খবরই তাদের জানা নেই।

ফ্যাক্টরবল ইসলাম

আধুনিককালের অনেক বিদ্যাভিমানী মন্তব্য করে থাকেন–ইসলামী জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করার অর্থ বর্বর যুগে এবং তাঁবুর যুগে ফিরে যাওয়া। ইসলামের বিরুদ্ধে এ ধরনের সন্দেহ আরোপ করা হয় কোনো যুক্তি বিচারের তোয়াক্কা না করে। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকলেও তারা এ বিষয়ে একমত হবেন যে, ইসলাম সভ্যতা ও প্রগতির পথে কখনও অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি।

ইসলাম এমন এক জনসমাজের মাঝে অবতীর্ণ হয়েছিল, যারা বেশির ভাগই ছিল বেদুঈন। তারা ছিল অত্যন্ত নির্মম ও কঠোর প্রকৃতির। ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো, এসব উগ্র ও পাষাণ প্রকৃতির লোকেরা ইসলামেরই প্রভাবে একটি মানবিক গুণসম্পন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছিল। তারা কেবল নিজেরাই সুপথপ্রাপ্ত হয়নি বরং মানুষকে স্রষ্টার পথে পরিচালিত করার নেতৃত্বও লাভ করেছিল। মানুষকে সভ্যতার আলো প্রদান করা ও আত্মার বিকাশ সাধন ছিল ইসলামের অলৌকিক ক্ষমতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আত্মার উন্নতি সাধন মানুষের সকল চেষ্টা ও সাধনার মূল্য লক্ষ্য হতে পারে। কারণ এটিই সভ্যতার অন্যতম চূড়ান্ত লক্ষ্য। ইসলাম কেবল আত্মিক উন্নতি সাধন করেই ক্ষান্ত হয়নি। সভ্যতার যেসব বিষয় বর্তমানে মানুষের মধ্যে বিশেষ আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং যাকে

অনেকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বলে মনে করেন, ইসলাম তার সবগুলোকেই গ্রহণ করেছে। ইসলামের সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক না-হলে মুসলমানেরা সব দেশের সভ্যতাকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। গ্রীক সভ্যতা থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত শাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র গ্রহণ করে ইসলাম এসবের পৃষ্ঠাপোষকতা প্রদান ও সমৃদ্ধ করেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন নতুন অবদান পেশ করেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ইসলাম গভীর ও একনিষ্ঠ প্রেরণা যুগিয়েছে। স্পেনের ইসলামী বৈজ্ঞানিকদের অবদানের উপরই ইউরোপীয় রেনেসাঁ ও তার আধুনিক আবিষ্কারগুলোর ভিত্তি গড়ে উঠেছিল।

মানবতার সেবায় নিয়োজিত কোনো সভ্যতাকে ইসলাম কখনই বিরোধিতা করেনি। অতীতের প্রতিটি সভ্যতার প্রতি ইসলামের যে মনোভাব ছিল বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিও তার মনোভাব সে রকমই। ইসলাম এসব সভ্যতার মহৎ অবদানগুলো গ্রহণ করেছে, আর ক্ষতিকর দিকগুলো পরিহার করেছে। সভ্যতা যতক্ষণ পর্যন্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে, ততক্ষণ ইসলাম তার বিরোধিতা করে না। কিন্তু সভ্যতা ও প্রকৃতি বলতে যদি মদ্যপান, জুয়া, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদির মত উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনৈতিকতা বুঝায়, তাহলে ইসলাম অবশ্যই তার বিরোধিতা করে এবং এর বিষাক্ত ছোবল থেকে মানবতাকে রক্ষার জন্যে যথাসম্ভব কর্মপন্থা গ্রহণ করতে অনুসারীদেরকে অনুপ্রেরণা যোগায়।

প্রকৃত প্রগতি

মানুষকে উদ্দেশ্যহীন, কর্তব্যহীন, দায়িত্বহীন, অর্থহীন করে সৃষ্টি করা হয়নি। নিরুদ্দেশের যাত্রী বানিয়ে মানুষকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি এ বিশাল জগত পরিসরে। মানুষকে একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানব সৃষ্টির মূলে রয়েছে সূক্ষ্ম যৌক্তিকতা ও কৌশল। সৃষ্টিকর্তাকে জানা এবং তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মানুষকে প্রতিনিধি রূপে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। প্রতিনিধির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাকে নানা প্রকারের বাধা-বিপত্তি ও দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। এসব প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে নিজের মৌল উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হওয়াই প্রগতির আসল অর্থ। ইসলাম মানুষকে সে শিক্ষাই দেয়। ইসলাম বলে : মানুষ বাঁচবে তার স্রষ্টার সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যে। বেঁচে থাকবে তার পরবর্তী চিরস্থায়ী জীবনের পাথেয় সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে। এরূপ জীবন পরিচালিত করাই প্রকৃত প্রগতি।

<><><><>

বাংলা নিউজ ম্যাগাজিন

চেতনাবোধের অবক্ষয়

- নিশুতি মজুমদার -

মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বোধসম্পন্ন জীব বলে স্বীকৃত। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ নিজের শ্রম, অধ্যবসায়, বুদ্ধিমতা দিয়ে আধুনিক সভ্যতা গড়ে তুলেছে। মানুষ বেঁচে থাকার প্রয়োজনে হিংস্র জীবজন্তুদের আক্রমণ থেকে নিজেদের আত্মরক্ষার তাগিদে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে আরম্ভ করেছিল। নিজেদের জন্য খাদ্য পরিচ্ছদ ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তারা আদিম প্রকৃতি ত্যাগ করে সভ্য সমাজের মানবিক গুণগুলি আয়ত্ত করেছিল। হিংস্র প্রবৃত্তি তথা জিঘিংসার মনোভাব বিসর্জন দিয়ে মানুষ দয়া, মায়া, সততা, আন্তরিকতা, প্রেম, ভালোবাসা, প্রভৃতি মানবিক গুণের অধিকারী হয়েছিল। তাদের মনে সহৃদয়তা ও অনুভূতির জন্ম হয়েছিল। সহানুভূতি, মমত্ববোধ, সহমর্মিতা ও সহাবস্থানের বিকাশ ঘটেছিল। তাদের চেতনাবোধের উত্তোরণের সঙ্গে সার্বিক উন্নতি ঘটেছিল মানব সমাজে। শিক্ষায়, দীক্ষায়, বিজ্ঞানে, শিল্প-সংস্কৃতিতে সাহিত্যে, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে এগিয়ে মানুষ আজ সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহে যাওয়ার মানসিকতায় পৌছেছে।

বর্তমান যুগের মানুষরা এমন এক পর্যায়ে পেয়েছে যেখানে নেই আগেরমত যৌথ পরিবার, নেই জ্যেঠা-জ্যেঠী, কাকা-কাকী, ঠাকুর্দা-ঠাম্মা, যাদের সঙ্গে ছিল এককালে ঐকান্তিক আন্তরিক সম্পর্ক। হারিয়ে গেছে আপনজন, আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে নিঃস্বার্থ যোগাযোগ। মানুষ আজকাল নিজের চাকরি, ঘর-সংসার নিয়ে ভীষন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নিজের প্রয়োজন ও স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু ভাবার অবকাশ নেই মানুষের। শ্রদ্ধা, ভালোবাসা উদারতা, আন্তরিকতা যা ছিল মানুষের যুগ যুগ ধরে সঞ্চয় করা, সে সব কথা মানুষ ভুলে যাচ্ছে। যে জায়গায় জন্ম নিয়েছে লোভ, লালসা, হিংসা ও স্বার্থপরতা। মানুষগুলি যেন এক মিথ্যে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। পরিচিত পরিমণ্ডল বা প্রতিবেশিদের সঙ্গেই সেই প্রতিযোগিতা। সে চাকরি, ঘর-বাড়ি, ছেলে-মেয়ে, এসি, গাড়ি, গৃহসজ্জা বা যে কোন বিলাস দ্রব্য নিয়েই হোক না কেন ? সকলের মনে আত্মগর্বী একই বক্তব্য - 'আমিই বা কম কিসে ?' এই আগ্রাসী মনোবৃত্তি যে উত্তরসূরি নূতন প্রজন্মকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে এই চেতনাবোধ ওদের মন থেকে হারিয়ে গেছে চিরতরে। তার ফলশ্রুতিতেই বর্তমান মানুষের সমাজে ঘটে চলেছে যত রকমের অদ্ভুত ঘটনাবলী। চারিদিকে চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি, ডাকাতি, ধর্ষণ, কালোবাজারি, নারী পাচার, মদ, ড্রাগস্, নানা মাদক দ্রব্যের চোরাই কারবার হাজার রকমের দুষ্কৃতীর ছড়াছড়ি।

তার ওপর আছে অবিবেচক সন্তানের বৃদ্ধ বাবা-মায়ের উপর অকত্য অত্যাচার, অসহায় বাবা-মাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া, অসহায় স্ত্রীর ওপর শারীরিক নির্যাতন, শ্বশুড়বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া ইত্যাদি। পত্রিকা খুললেই দেখা যায় ভাই-ভাইকে হত্যা করছে, স্ত্রী উপপতির সঙ্গে মিলে স্বামীকে, স্বামী-স্ত্রীকে হত্যা করেছে। কোথাও আবার এমন ঘটনা ঘটছে, দুই তিন ছেলে মেয়ের মা নিজের ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। স্বামী নিজের স্ত্রীর অজান্তে আবার বিয়েতে বসেছে। আরো আছে একের পর এক লাভ জিহাদের ঘটনা। এসব দেখে শুনে মনে একটাই প্রশ্ন আসে - 'মানুষ কি আবার ফিরে যেতে চাইছে সেই আদিম যুগে ?' যাদেরকে সভ্য মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব বলা হয় তাদের সঙ্গে বন্য প্রাণীদের কি তফাৎ ? এই মুহূর্তে যেন বিশ্লেষণ করে দেখার সময় এসেছে। অথচ শৈশব থেকেই গুরুজনদের মুখে শুনতাম শ্রদ্ধা, বিশ্বাস যোগ্যতা ও মানুষের সেবা করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন - "ত্যাগেই ধর্মের আরম্ভ, ত্যাগেই উহার সমাপ্তি, ত্যাগ কর।" আর বলেছেন "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজছি ঈশ্বর ? জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

আমরা জানতান সুখে শান্তিতে জীবন যাপনের একটাই সূত্র লোভ সংবরণ ও সংযম। যারা নিজেকে নিবৃত্ত করতে জানে, সংযত করতে জানে, তারাই সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনের অমৃতফল লাভ করতে পারে।

প্রাসঙ্গিক হিসাবে রূপকথার একটি গল্প বলেই এই নিবন্ধ শেষ করছি - ভগবানের একজন পরমভক্ত ছিল কোনো এক গ্রামে। একদিন ভগবান নিজে এসে ভক্তকে বলেছেন আমি তোমার ওপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি এই দুঃখের পৃথিবীতে থেকে আর লাভ নেই। আমি তোমাকে অন্য কোন জগতে নিয়ে যেতে চাই।

ভক্ত বলে - প্রভু অন্য জগৎ সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে যাবেন, সে জগৎ যদি আগে একবার দেখে নিতে পারতাম তবে খুব ভালো হতো। প্রভু বললেন - তোমার জন্য দু'টি জগৎ আছে, এক নরকে এবং অন্যটি স্বর্গ। তোমাকে সেই জগৎ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তুমি যে জগতকে ভালো বলে দেখবে সেখানেই তোমার থাকার ব্যবস্থা করব।

ভক্ত বলে - প্রভু আমি নরকধাম দেখতে চাই।

প্রভু বলেন - তথাস্তু।

ভক্ত নরকে গিয়ে পৌছালো। খুব সুন্দর, মনোরম জায়গা। এখানে পৃথিবী থেকে অনেক সুন্দর আবহাওয়া, ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, ফুলের বাগান, অপূর্ব সব দৃশ্যাবলী। কিন্তু এখানে বসবাস করা মানুষদের মুখ শুকনো, ম্রিয়মান, বিষাদ মাখা। অল্প পরেই ছিল মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়। এখানে নিয়ম অনুসারে নাগরিকরা সকলেই একসঙ্গে বিশাল গোল টেবিলে চেয়ারে বসে খেতে হয়। টেবিলে প্রচুর পরিমানে নানা ধরনের আহার্য রাখা আছে। ভালো পোশাক পরিধান করে নাগরিকরা টেবিলকে কেন্দ্র করে বসে আছে। ভক্ত আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলো প্রত্যেকের দুহাতে লম্বা লম্বা দু'টি করে চামচ বেঁধে রাখা হয়েছে বগল অর্থাৎ বাহুমূলের নীচ পর্যন্ত মজবুত করে। কাজেই চামচ ব্যবহার করে নিজেই মুখে খাবার তুলতে পারছে না। এক সময় খাওয়া শেষ হওয়ার ঘন্টা বাজলো। সকলেই উঠে পড়লো, কিন্তু কেউই নিজের মুখটি দানাও তুলতে পারলো না। ভক্ত বুঝতে পারলো এখানে লোকদের সবই আছে কিন্তু ওরা খেতে পারে না, তাই এদের মুখ শুকনো, বিষাদ মাখা।

এবার প্রভু ভক্তকে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। স্বর্গের অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে ভক্ত অবাক! পরিবেশ, পরিস্থিতি অনেকটাই নরকের মত। কিন্তু এখানের নাগরিকদের মুখে তৃপ্তির হাসি লেগে আছে। সকলেই বিভিন্ন কারণে উৎসবের মেজাজে আনন্দে মগ্ন। এখানেও সেই আহারের জন্য গোল টেবিলের ব্যবস্থা। সকলেই সুন্দর সাজপোষাকে খেতে বসেছে। ঠিক নরকের মতই প্রত্যেকের হাতে দুটি করে লম্বা চামচ বাঁধা আছে। ওরা খেতে বসেছে, ভক্ত আশ্চর্য হয়ে দেখলো, প্রথম জন তার লম্বা চামচ দিয়ে খাবার তুলে নিজের মুখে নয় বাঁদিকে বসা দ্বিতীয় জনের মুখে নিশ্চিন্তে দিচ্ছে। দ্বিতীয় জন তৃতীয় জনের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছে। এমনি করে সকলেই তৃপ্তিতে পেট পুরে খাবার খেতে পারছে। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজে না খেয়ে অন্য একজনকে খাওয়াচ্ছে। এর ফলে ত্যাগ ও হলো এবং অন্য জনের ভোগ ও হলো।

এত সুন্দর সমাধান দেখে, ত্যাগের মানসিকতা দেখে ভক্ত আপ্লুত হল। প্রভুকে প্রণিপাত করে জানালো 'এ-জগতে থাকতে আমার বিন্দু মাত্র আপত্তি নেই'।

<><><><><>

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব : হবিবুর রহমান চৌধুরী

- আ.ফ.ম. ইকবাল -

জীববিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল জেনেটিক্স বা বংশগতি। জেনেটিক্স- এর মাধ্যমে একথাই বুঝানো হয় যে, সন্তানের মধ্যে তার বাবা-মা, বা তারও পূর্বপুরুষ থেকে জিনগত কিছু বৈশিষ্ট্য স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। যার মাধ্যমে বাবা-মায়ের, বা কোনো পূর্বপুরুষের সাথে সন্তানের অনেক সামঞ্জস্য, অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। বংশগতির ধারক ও বাহক সমূহের এই ব্যাখ্যার পক্ষে বিজ্ঞানী স্ট্রাসবুরগার ১৮৭৫ সালে সর্বপ্রথম ক্রোমোজোম আবিষ্কার করেন।

বলতে চাইছি হবিবদার কথা। আমাদের সবার পরিচিত, দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গের সম্পাদক হবিবুর রহমান চৌধুরির কথা। তার দাদা, পশ্চিম করিমগঞ্জ অঞ্চলের সাদারাশি গ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামী মৌলবি হাজি হাজির আলি একাধারে ছিলেন একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী, শিক্ষক, সংগঠক, সমাজকর্মী এবং সম্পাদক। শিক্ষকতা করতেন একটি মাদ্রাসায়। ছিলেন করিমগঞ্জের মুন্সেফ কোর্টের একজন অনারারি মুন্সেফও। পরবর্তীতে তাঁরই উদ্যোগে নির্মিত হয় করিমগঞ্জ মুন্সেফ কোর্ট জামে মসজিদ, যা আজ জেলার অন্যতম বিশেষ আকর্ষণীয় ইবাদতখানা। তাছাড়াও ছিলেন করিমগঞ্জ হাইমাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠছিল স্বদেশী বিদ্যালয়, সেই প্রেক্ষাপটে করিমগঞ্জেও তৎকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামিরা গড়ে তুলেছিলেন একটি স্বদেশী বিদ্যালয়। সেই প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন হাবিবদার দাদা। সেই বিদ্যালয়টি আজ করিমগঞ্জ পাব্লিক হাইয়ার সেকেন্ডারি স্কুল নামে প্রসিদ্ধ।

হাজি হাজির আলী সম্পাদনা করতেন একটি হাতে-লেখা পত্রিকাও। ফার্সি ভাষায় প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক আল-ইসলাহ'। সম্প্রতি উনার পৌত্র, হবিবদার অনুজ ডঃ মুজিবুর রহমান চৌধুরি (মুজিব স্বদেশী) সেই আল-ইসলাহ পত্রিকার একটি কপি সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরেছিল। কপিটির প্রকাশকাল- ২২শে রবিউল আউয়াল, ১৩৪৮ হিজরি, মোতাবেক ২৮ আগস্ট, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ। সেটি ছিল কাগজটির প্রথম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।

সেই পত্রিকার কপি থেকে যেটুকু পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে, তাতে একজন চেতনা সমৃদ্ধ দেশপ্রেমিকের সম্যক ধ্যান ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। যে কথাটি আমাকে আশ্চর্যান্বিত করেছে, তা হল সেই অত্যন্ত সীমিত এবং ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রিত জনসংযোগের যুগে, আজ থেকে চুরানব্বই বছর আগে করিমগঞ্জের এক প্রান্তিক অঞ্চলে বসে তিনি সম্পাদকীয় লিখেছেন আফগান সঙ্কটের উপর ! সেই সম্পাদকীয় থেকে দুটি লাইনের তর্জমা তুলে ধরছি।

"..... আফগানিস্তানের করুণ ও বিধ্বস্ত অবস্থা..... এবং মুজাহিদিনদের অগ্রগতি এবং এই বিপদ ও ধ্বংস থেকে আফগানিস্তানের পরিত্রাণের একমাত্র উপায় সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, তাই আমি আমার ভারতীয় ভাইদের মহান বিশ্বাস এবং শুভ ইচ্ছার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আমি আশা করি যে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা অবিলম্বে আফগান জাতিকে ধ্বংসের এই অবস্থায় বাঁচাতে সহায়ক হবে।....."।

কী দারুণ সংবেদনশীলতা ! আজ দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গ পত্রিকায় হবিবুর রহমান চৌধুরি লিখিত নিয়মিত এবং প্রতিনিয়ত যে সব বলিষ্ঠ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হচ্ছে, তাকে জেনেটিক উত্তরাধিকার ব্যতিত কী আর বলা যেতে পারে।

পরবর্তী প্রজন্মে, হবিবদার বাবা, প্রয়াত আজিজুর রহমান চৌধুরীও ছিলেন একজন শিক্ষক এবং সংগঠক। ছিলেন জেলা স্তরের কর্মকর্তা। শেষ জীবনে শিক্ষকতা ছেড়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাচিত পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধি হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে জনসেবা করে গেছেন।

এই যে সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা, তা হবিবদাদের পারিবারের

জন্য যেন একটি পারিবারিক উত্তরাধিকার। উনার চার ভাইয়ের জৈষ্ঠ্য, প্রয়াত আতিকুর রহমান চৌধুরী ছিলেন একটি সিনিয়র মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক। সেই সঙ্গে আসাম মাদ্রাসা টিচার্স এসোসিয়েশন-এর করিমগঞ্জ জেলার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। আমৃত্যু ছিলেন এই পদে। ছিলেন একজন ছড়াকারও। নিয়মিত 'আজকের ছড়া' লিখতেন নববার্তার প্রথম পৃষ্ঠায়। তাঁর ছড়ার বইও বেরিয়েছে।

দ্বিতীয় ভাই আবিদুর রহমান চৌধুরিও একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ছিলেন জেলা শিক্ষক সম্মেলনীর দীর্ঘদিনের সভাপতি। তাছাড়াও ছিলেন শক্তিপদ দাস মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশনের ভারত-বাংলাদেশের কো-অর্ডিনেটর। যে সংগঠন ক্যানসার সচেতনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত।

সকলের ছোট, সুসাহিত্যিক ডঃ মুজিবুর রহমান চৌধুরি, যাকে সকলেই মুজিব স্বদেশী হিসেবে চেনেন, সেও একজন সফল সংগঠক। এক সময় ছিল রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজের প্রভাষক। বর্তমানে স্বপ্নিল গ্রুপ অফ ইনস্টিটিউট-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সেই সঙ্গে জেলা জুবিনাইল জাস্টিস বোর্ডের একজন সাম্মানিক সদস্য।

এবার আসি মূল কথায়। হবিবদাকে যেমন দেখে আসছি। যতদূর মনে পড়ে, বছরটা ছিল ১৯৮১-৮২। আমরা তখন প্রি-ইউনিভার্সিটির ছাত্র। করিমগঞ্জ কলেজে সদ্য ভর্তি হয়েছি মাত্র। আমাদের কলেজের ঐতিহ্য ছিল, প্রতিবছর বার্ষিক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠান আয়োজন করা। সে বছরও মিলাদ কমিটি গঠিত হল। কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন বিএসসি ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র হবিবুর রহমান চৌধুরি। মিলাদ কমিটির সেক্রেটারি হবার আগে পর্যন্ত কোনো চেনাজানা ছিল না হবিবদার সঙ্গে। খুব দক্ষতার সঙ্গে জাঁকজমকপূর্ণভাবে সেবছর মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হলো। হবিবদা ভক্তিমূলক নজরুলগীতি সহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রায়ই অংশগ্রহণ করতেন। এবছর সম্পাদকের গুরুদায়িত্ব পালন করেও সহপাঠিদের নিয়ে অনুষ্ঠানে খুব উন্নতমানের তিনটি সমবেত গজল পরিবেশন করলেন যা এখনও ভুলতে পারিনি। ভালো করে পরিচয় গড়ে উঠল হবিবদার সঙ্গে। তারপর অনেকবার গেছি উনাদের বাড়িতে। একপ্রকার ঘরের মানুষের মত সকলের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছি। তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার সম্বন্ধে অবহিত হতে পেরেছি যৎকিঞ্চিত হলেও। সম্বন্ধের সেই প্রারম্ভ, যা আজ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে অব্যাহত রয়েছে। আজ যদিও আমি হাফলং শহরে প্রবাস জীবন অতিবাহিত করছি, কিন্তু আমাদের সম্বন্ধ আজও অগ্রজ অনুজের মত বহাল রয়েছে- দূর থেকে হলেও।

কলেজ জীবন শেষ করে উনি বেরিয়ে গেলেন। আমরাও অনুসরণ করলাম। শুরু হল পরবর্তী জীবন সংগ্রামের পেছনে দৌড়ানোর পালা।

এইখানে এসে আসামের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে কিছু কথা বলতে হয়। তথাকথিত বিদেশি বিতাড়নের নামে ১৯৭৯ থেকে চলে আসা আসাম আন্দোলনের ফলে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ায় একসময় কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে রাজ্যে রাষ্ট্রপতিশাসন জারি করে। পরবর্তীতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হলে, ১৯৮৩ সালে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস দল সেবার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শ্রী হিতেশ্বর শইকিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩তে। কিন্তু আন্দোলনকারীদের ডামাডোল তখনও অব্যাহত ছিল। সম্ভাবনা ছিল যেকোনো সময় সরকার ভাঙতে পারে। এই পরিস্থিতিতে কিছু নেতা, স্থানীয়ভাবে পরবর্তী নির্বাচনের জন্য নিজেদের মাঠ তৈরি করতে নেমে পড়েছিলেন। এই পরিক্রমায় প্রান্তিক জেলা করিমগঞ্জের সদর শহরের এক প্রত্যাশী সিরাজুল হক চৌধুরী উরফে মায়া মিয়া, উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। উল্লেখ্য যে, করিমগঞ্জ সবেমাত্র জেলাস্তরে উন্নীত হয়েছে। **করিমগঞ্জ জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ১লা জুলাই। তৎকালীন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী মোহাম্মদ ইদ্রিস সাহেবের হাত ধরে।**

সে যাক, বলছিলাম সিরাজুল হক চৌধুরীর কথা। রাজনৈতিক লড়াইয়ের ক্ষেত্র তৈরি করতে চাই ব্যাপক গণসংযোগ। এই গণসংযোগ গঠনের লক্ষ্যে গঠিত হয় একটি এনজিও- 'পিপলস ওয়েলফেয়ার অর্গেনাইজেশন'। আবশ্যক বোধ হল এবং সিদ্ধান্ত হল প্রকাশ করা হবে সংগঠনের একটি মুখপত্র। একটি পত্রিকা। পত্রিকা প্রকাশ করতে হলে চাই একজন দায়িত্বশীল সম্পাদক। কিন্তু কাকে দেয়া যেতে পারে এই দায়িত্ব?

ডাক পড়ল তরুণ উদ্যমী সংগঠক হবিবুর রহমান চৌধুরির। কিছু শর্তাবলী রাখলেন সোসাইটির কর্মকর্তাদের সামনে। কেবলমাত্র এইসব শর্ত পালন হলে তবেই দায়িত্ব নিতে পারেন পত্রিকা সম্পাদনার। 'কলমের উপর কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ চলবে না'- সহ গুরুত্বপূর্ণ কিছু শর্তাবলী মেনে নিল সংগঠন। এখানে এসব আলোচনার আবশ্যকতা নেই যদিও, একটু বলতেই হয় যে, সময়োচিত সেই শর্তাবলী উত্থাপন করার মত সতর্কতা অবলম্বন করতে পেরেছিলেন বলেই আজও নববার্তা প্রসঙ্গ পত্রিকা তার যাত্রাপথে অব্যাহত রয়েছে ৩৮ বছর ধরে।

সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নববার্তা' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালের ১১ জুলাই। সে বছর প্রবল বন্যার প্রকোপে পড়েন জেলার মানুষ। তদান্তিন জেলাশাসক সহ অন্যান্যদের বিরুদ্ধে, বন্যাক্রান্তদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার তীব্র অভিযোগ উত্থাপন করে নববার্তা।

রেজিস্ট্রেশন না থাকার অজুহাত দেখিয়ে, প্রথমে শোকজ এবং পরবর্তীতে কয়েক সপ্তাহ চলার পর একসময় পত্রিকা প্রকাশনা বন্ধ করতে বাধ্য করা হয়। অনেক সংগ্রামের পর অবশেষে Registrar of Newspaper for India থেকে এসে পৌঁছাল Central Government Registration No. 'নববার্তা প্রসঙ্গ' নামে পত্রিকাটি পঞ্জিকৃত হয়। এতে সহযোগিতা করেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ প্রয়াত নৃপতি রঞ্জন চৌধুরী। জন্মলগ্ন থেকেই পত্রিকার সবগুলো সংখ্যাই দেখার সুযোগ হয়েছিল। প্রথম থেকে যখন বড় বড় হরফে হেডলাইন দেখতাম 'জেলার সর্বত্র পুলিশি নির্যাতন বন্ধ করতেহবে- পিপলস ওয়েলফেয়ার আগেনাইজেশন', 'পুলিশ লকআপে বন্দীর মৃত্যু', 'পুলিশের - পদাঘাতে বৃদ্ধার জীবনাবসান' ইত্যাদি কলামগুলো। ভাবতাম এ কোন অগ্নিশিখার আবির্ভাব ঘটতে চলেছে!

ইতিমধ্যে রাজ্য রাজনীতিতে পট পরিবর্তনের পালা। সহিংস হয়ে উঠা আসাম আন্দোলন সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রয়াত **প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির নেতৃত্বে স্বাক্ষরিত হল বিতর্কিত ত্রিপক্ষীয় আসাম চুক্তি। ১৯৮৫-র পনেরোই আগস্ট।** আসাম চুক্তির একটি ধারা অনুসারে মাঝপথেই ভেঙে দেয়া হল আসাম সরকার। নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। ক্ষমতার অলিন্দে চড়ে বসলেন নেলি গহপুরের নারকীয় হন্তারক বাহিনী!

নতুন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হবার কিছুদিন পরই করিমগঞ্জ সফরে এলেন প্রফুল্ল মহন্ত। তারিখটি ছিল ১৯৮৬-র ২১শে জুলাই। জেলার সকল স্তরের জনতা সেদিন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলেন নবগঠিত সরকারের ভাষা সার্কুলারের প্রতিবাদ জানাতে। সে ছিল এক স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালনের কর্মসূচি। সেই নিরস্ত্র প্রতিবাদী জনতার উপর বিনা প্ররোচনায় গুলিবর্ষণ করতে লাগলো মহন্তের পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থলে ঢলে পড়ল দুই তরতাজা যুবক জগন-যীশুর লাশ! তারপর সে কি অকথ্য নির্যাতন করিমগঞ্জ শহর ও শহরতলীর মানুষের উপর!

প্রফুল্ল মহন্তের সেই পুলিশি নির্যাতনের তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সাহসী ভূমিকা পালন করে গিয়েছিল নবজাত পত্রিকা সাপ্তাহিক নববার্তা প্রসঙ্গ। সেই সাহসী ভূমিকা পালনের জন্য একদিকে যেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সাপ্তাহিক নববার্তা প্রসঙ্গ, অপরদিকে ব্যাপক পরিচিতি গড়ে উঠে সম্পাদক হবিবুর রহমান চৌধুরির। সেই সগর্ব যাত্রা অবিরাম চলছে আজ অবধি। যদিও সম্পাদককে অনেক হুমকির মোকাবেলা করতে হয়েছে সময় সময়।

আমি তখন সবেমাত্র কিছু কবিতা লিখছি। স্যার কামালুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত দিগ্বলয়ে তার কিছু কিছু প্রকাশিত হচ্ছে। কিছু কবিতা স্যার নিজে পাঠিয়ে দিতেন কলকাতা। যার কিছু থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'নতুন গতি'তে। সেই আমার যাত্রারম্ভ বলা যেতে পারে। কিন্তু গদ্যে হাত দেবার সুযোগ এবং হিম্মত কিছুই ছিল না তখনও। করিমগঞ্জ থেকে প্রকাশিত তখনকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল যুগশক্তি, যা কেবল বড় বড় গুণীজনদের ছিল বিচরণ ক্ষেত্র বলেই ভাবতাম। যদিও একসময় সেই যুগশক্তিতে আমার 'কাগজ পুরাণ' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিতে সহায়ক হয়েছিল।

সে যাক, নতুন আঙ্গিকে নতুন পত্রিকা নববার্তা প্রসঙ্গ যখন নিয়মিত প্রকাশিত হতে লাগল, নবীন হাতে কলম তুলে নিয়ে লিখতে লাগলাম 'আছিমগঞ্জের চিঠি'। নিজের অঞ্চলের কিছু স্থানীয় সমস্যা তুলে ধরার সে ছিল প্রাথমিক প্রয়াস। আজ বলতে বাধা নেই, সেই সুযোগ এবং হাবিবদার প্রশ্রয়ের ফলশ্রুতিতে যে যাত্রারম্ভ হয়েছিল, যথাসাধ্য তা চালিয়ে যাবার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে পেরেছি আজ অবধি। এই, এবারের সেপ্টেম্বর মাসে, বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় আমার মোট ২৯টি লেখা প্রকাশিত হয়েছে। যার ৭টিই দৈনিক নববার্তা প্রসঙ্গে।

আগেই বলেছি, করিমগঞ্জ থেকে অনেক দূরে, বড়াইল পাহাড়ের চূড়ায় বসবাস করছি যদিও, হবিবদার অনুজপ্রতিম ভালবাসা থেকে কখনও বঞ্চিত হইনি। নিজে জানতামও না কখন করিমগঞ্জ থেকে কোন বিশেষ ম্যাগাজিন বেরুচ্ছে। কিন্তু ঠিক সময়মতো হবিবদার নির্দেশনা এসে যায়- অমুক উপলক্ষে ম্যাগাজিন বেরোবে। তোমার লেখা চাই-ই। এভাবে বরাকের সাথে, বিশেষ করে নিজের জেলার গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনাগুলোর সঙ্গে আমাকে নিয়মিত বিজড়িত করে রেখেছে হাবিবদার ভালবাসা। আর নববার্তা প্রসঙ্গে প্রেরিত লেখাগুলোর কথা বলার আবশ্যকতা রয়েছে বলে মনে করি না। আশাকরি নববার্তা প্রসঙ্গের পাঠক মহল

সেগুলো নিয়মিত দেখে আসছেন। যতদূর লক্ষ্য করে দেখেছি, এবছর, অর্থাৎ ২০২৩ সালে প্রায় চল্লিশটিরও অধিক লেখা কেবল নববার্তা প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। যার জন্য যতটা নিজে পরিতৃপ্তিবোধ করে থাকি, তার চাইতে অধিক কৃতজ্ঞতা হবিবদার প্রতি।

আরেকটি কথা না বললে সত্যের অপলাপ হবে। অনেকেই হয়তো ভাবতে পারেন, যেহেতু আমার অনেক লেখা আজকাল বিভিন্ন পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, হয়তো সেগুলোর জন্য অনেক পারিশ্রমিক বা সাম্মানিক পেয়ে থাকি। কিন্তু এই প্লাটফর্মে স্পষ্ট করে বলতে চাইছি, হ্যাঁ, একসময় নিয়মিত পারিশ্রমিক পেতাম গৌহাটি থেকে প্রকাশিত সুকুমার বাগচী সম্পাদিত দৈনিক সময় প্রবাহ থেকে। পরবর্তীতে, ২০১০-১১ পর্যন্ত যখন নিয়মিত লিখতাম দৈনিক প্রান্তজ্যোতি পত্রিকায়, সেখান থেকেও নিয়মিত সাম্মানিক পেতাম। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে যে লেখাগুলো প্রকাশিত হচ্ছে, নববার্তা প্রসঙ্গ ছাড়াও আরও চারটি দৈনিকে, তার মধ্যে কেবল একজন সম্পাদক ছাড়া আর কারও কাছ থেকে একটি টাকাও পাইনি। কখনও চাইওনি কারো কাছে। তবু কেবল একজন সম্পাদক দিয়ে থাকেন হামেশা। তিনি হচ্ছেন হবিবদা, যিনি কয়েকদিন পরপর, নিয়মিত কিছু, উনার ভাষায় 'হাদিয়া' পাঠিয়ে দেন ইউপিআই-র মাধ্যমে।

আসলে লেখালেখি যাদের নেশা হয়ে যায়, তারা টাকাপয়সা পাওয়ার জন্য কেউ লেখেন না। কিন্তু এই লেখাগুলো তৈরি করতে, তথ্য সংগ্রহ করতে, টাইপ করে পাঠাতে যে মানসিক ও কায়িক শ্রম হয়ে থাকে, কোনো সম্পাদকই তার যথাযথ মূল্য দিতে পারবেন না। কিন্তু তার মধ্যেও মানবিকভাবে উদ্দীপনা জোগানোর জন্য টাকাপয়সাটাও যে একটি অনুপ্রেরণার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে- সেই অনুভব উপলব্ধি করে থাকি হবিবদার আচরণ থেকে।

কথা প্রসঙ্গে মানবিক আচরণের কথা এলই যখন, 'মানুষ' হবিবদার আরও একটি বৈশিষ্ট্যর কথা বলতেই হয়।

আজকের দিনে, এই যে জাতপাত আর ধর্মের নামে বিভেদ বৈষম্যের যখন খোলাবাজার চলছে, 'ওরা-আমরা' করে সমাজকে বিভাজিত করতে লেগে আছেন একশ্রেণির রাজনীতিবিদ, সেই পারিপার্শ্বিকতায় সম্পাদক হবিবুর রহমান চৌধুরির কাছ থেকে সেই নেতাদের শেখার রয়েছে অনেক কিছু।

সরকারি স্বীকৃতি সহ নববার্তা প্রসঙ্গ সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশনা শুরু হয়েছিল সেই ১৯৮৬-র ২৪ এপ্রিল। তারপর তা অর্ধ-সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশনা প্রারম্ভ হয় ১৯৯২-এর ৭ সেপ্টেম্বর। পরবর্তীতে ২০০৮- এর ২০ এপ্রিল থেকে করিমগঞ্জ জেলার একমাত্র দৈনিক হিসেবে উন্নীত হয়ে আজ অবধি নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। সেই সঙ্গে নববার্তা প্রকাশনা থেকে আরও একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক-The Challenger Barta নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে ১৯৯৪-র ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে। আর অতি সম্প্রতি, এবছরের ১২ জুলাই থেকে প্রকাশনা শুরু হয়েছে 'নববার্তা টুডে পোর্টাল'-এর। নববার্তা প্রসঙ্গের যাত্রাপথের এই ক্রমধারা তুলে ধরলাম একথা বুঝানোর জন্য যে, ধারাবাহিকভাবে নববার্তা প্রকাশনা পরিবার কিভাবে ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠছে, তা অনুমান করার জন্য। নিঃসন্দেহে এই পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলেছে কর্মীর আবশ্যকতা। আজ যে কেউ, বিশেষ করে ওই বিভাজনকামী রাজনীতি জীবিরা যদি নববার্তা প্রসঙ্গ দপ্তর পরিদর্শন করতে যান, দেখতে পাবেন সেখানকার আশি শতাংশের ও অধিক স্টাফ অমুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ। যদিও হবিবদা অনেক সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সেবায় বিজড়িত রয়েছেন, তবু তার মানবিক আচরণ, বিশেষ করে এই বিপুল সংখ্যক স্টাফের সঙ্গে অতুলনীয়, দৃষ্টান্তমূলক। সকলের সঙ্গে ভ্রাতৃপ্রতিম।

এযাবত তিনি দেশ-বিদেশে প্রায় শতাধিক সংবর্ধনা পেয়েছেন, পেয়েছেন বিভিন্ন অ্যাওয়ার্ডও। হয়তো খানিকটা আবেগিক হয়ে লেখা লম্বা হয়ে যাচ্ছে, তাই আর দীর্ঘায়িত না করে এই লেখার ইতি টানতে চাইছি। পরিশেষে এটুকুই বলতে চাই যে, ব্যক্তি হবিবদার মধ্যে আমার দৃষ্টিতে ধরা পড়ে এক মানবিক সত্ত্বা, সামাজিক ব্যক্তিত্ব এবং দরদী লিডারশিপ, যা তাকে দিয়েছে অনন্য পরিচয়। যা তাকে ধরে রাখবে সমাগত সময়ের সুরক্ষিত আলোকবর্তিকা স্বরূপ। তার সুস্থ দীর্ঘজীবন কামনা করছি।

<><><><><>

এক নীরব সংগ্রামের নাম হবিবুর রহমান চৌধুরী

- মৃণাল সরকার -

সেই ছোট্টবেলায় স্কুলের কোনো এক বইয়ে পড়েছিলাম "লাইফ ইজ অ্যা জার্নি" জীবনের এই আঁকা বাঁকা যাত্রাপথে আমরা কত মানুষের সঙ্গে পরিচিত হই,আবার কালের চক্রে কত মানুষের চেহারা স্মৃতির অন্ধকারে চলে যায়। এক একটা জীবন ঠিক যেন গল্পের চরিত্রের মতো আর প্রত্যেকের গল্পে এক একটা বিশেষ চরিত্রের প্রভাব খুব সহজেই আমরা উপলব্ধি করতে পারি। কিছু কিছু চেহারা চরিত্র যেন মৃত্যু অব্দি মন মস্তিষ্কে সজীব হয়ে বেঁচে থাকে। আমার ব্যক্তি জীবনের গল্পে ঠিক সে রকম এক চরিত্রের বিশেষ এক ছায়া অবশ্যই পড়েছে ,যাকে অস্বীকার করে বা ডিঙিয়ে আগামী দিনের পথ চলা আমার কাছে দুষ্কর হয়ে দাঁড়াবে । তিনি আর কেউ নন, আমার শ্রদ্ধেয় দাদা হবিবুর রহমান চৌধুরী। এই লোকটার নামের পেছনে এক গাদা বিশেষণ লাগালেও আমার কাছে হবিবুরদা-ই যথেষ্ঠ। ঠিক কবে হবিবুর দার সাথে প্রথম দেখা, সেটা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না , তবে আবছা আবছা অতীতের গভীরে গিয়ে একটা ডুব দিলে চোখের সামনে ভেসে আসে কিছু বিক্ষিপ্ত স্মৃতি। হ্যাঁ, মনে পড়ছে, সেই প্রথম প্রথম সংবাদ লেখার সেই দিনগুলোর কথা। ২০০২-০৩ সালে আমি দৈনিক সোনার কাছাড় পত্রিকায় বারইগ্রামের প্রতিনিধি হয়ে সংবাদ লিখতাম। পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখার লোভ বড্ড পেয়ে বসেছিল, তাই প্রতিদিন অনেকগুলো নিউজ লিখতাম তখন। একদিন অরূপ রায়ের সঙ্গে শম্ভু সাগর পার্কের ঠিক উল্টো দিকের একটি ছাপা খানায় গিয়েছিলাম। এই ছাপা খানার নাম মডার্ণ প্রিন্টার্স। এখান থেকেই অর্ধ সাপ্তাহিক নববার্তা প্রসঙ্গ বের হতো । আমার কিছু নিউজ সেই পত্রিকায় দেওয়া শুরু করলাম। সেদিন পরিচয় হয়েছিল দুজনের সঙ্গে । একজন মিহির দা মানে মিহির দেবনাথ আর দ্বিতীয়জন হবিবুর দা । আমি করিমগঞ্জ এলেই চলে আসতাম এই ছাপা খানায়। এখানে কাজের সঙ্গে নানা ধরনের গল্পের

আসর, বড় বড় লোকের আনাগোনা লেগেই থাকত। নিজের পরিচিত মহলের পরিধি বিস্তার করতে এর চেয়ে উত্তম স্থান সম্ভবত আর কোথাও খুঁজে পাইনি। যাই হোক , মডার্ণ প্রিন্টার্স এর সঙ্গে তখনকার নবীন সাংবাদিক মৃণালের ভাব জমিয়ে নিতে বেশ সময় লাগেনি । পুরো প্রতিষ্ঠানের মালিক হবিবুরদাকে দেখলে কে বলবে তিনি একজন মালিক। চেহারা থেকে আচরণে মালিকজনিত কোনো লক্ষণ ছিল না, এমনকি এখনও নেই । দেখতে একেবারে সাদামাঠা এক মানুষ যে ভেতরে ভেতরে একটি বিশাল মহীরুহ হয়ে আছেন , সেটা উপলব্ধি করতে আমার সময় লেগেছিল প্রায় বিশ বছর । এই এতগুলো বছরে কবে যে তিনি আমার একান্ত আপন হয়ে উঠেছেন , সেই হিসেব আমার কাছে নেই। স্মৃতির পটে শুধু আছে দাদার শাসন, ভাইয়ের আবদার, মান অভিমান আর দুর্দিন থেকে সুদিনের অনেক কথা। অনেকেই হবিবুর দাকে নিয়ে অনেক সংজ্ঞা নির্ধারণ করে থাকেন, তবে যারা হবিবুর দাকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তারা ঠিকই জানেন যে তিনি মানুষ হিসেবে কত বড় মনের। এই দীর্ঘ দুই দশক খুব কাছ থেকে দেখেছি বলেই আমি হয়তো ছোট বড় বিক্ষিপ্ত অনেক ঘটনার সাক্ষী। একটা সাপ্তাহিক পত্রিকাকে পরবর্তীতে অর্ধ সাপ্তাহিক এবং শেষপর্যন্ত দৈনিক হিসেবে জন্ম দিতে গিয়ে যে প্রসব যন্ত্রণার শিকার হয়েছিলেন হবিবুর দা , তাঁর কয়েক শত ভাগের এক ভাগ আমরাও উপলব্ধি করেছি। সে তো গেল আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় । সামাজিক ক্ষেত্রে এই লোকটার অবদানের উপমা লিখতে গেলে অনেকগুলো পাতার প্রয়োজন হবে।

মনে পড়ছে ২০১৩ সালে করিমগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী বিসর্জন ঘাট গড়ে ওঠার পেছনে হবিবুর দার অবদানের কথা। কুশিয়ারা নদীর এই বিসর্জন ঘাট দিয়ে প্রতি বছর প্রতিমা নিরঞ্জন পর্ব হয়ে থাকে। তখন প্রতিমা বিসর্জনের জন্য উন্নতমানের কোনো বন্দোবস্ত ছিল না । সে সময় পুরপতি ছিলেন ডা° মানস দাস । বিসর্জন ঘাট নির্মাণে সরকার অর্থ রাশি বরাদ্দ দিলেও অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল আদালতে চলা সাত সাতটি মামলা । এর মধ্যে চারটি সিভিল স্যুট আর তিনটি ক্রিমিনাল কেস। তৎকালীন জেলা শাসক সঞ্জীব গোহাই বড়ুয়ার বিশেষ অনুরোধে দীর্ঘদিনের বিবাদ নিষ্পত্তি করার উদ্দেশ্যে মুখ্য আহ্বায়কের দায়িত্ব নিয়ে মাঠে নামেন

হবিবুর দা । তাঁর অনেক দৌড়ঝাঁপ এবং অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বিসর্জন ঘাটের আইনি বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটে । এক্ষেত্রে তাকে অবশ্য বিশেষ সহয়োগিতা করেন সদ্য প্রয়াত সমাজসেবী শিক্ষাবিদ মহীতোষ দাস এবং তৎকালীন পুরপতি ডাঃ মানস দাস । এরপর বিসর্জন ঘাট নির্মাণের শিলান্যাস এবং পরবর্তীতে উদ্বোধন । এই পর্বে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ । এই দুটো সভাতেই বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা প্রাক্তন অধ্যক্ষ চন্দ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য সহ শহরের বিশিষ্ট জনেরা প্রকাশ্যে হবিবুর রহমান চৌধুরীর ভূমিকার বেশ প্রশংসা করেন । মনে আছে সেদিন শ্রদ্ধেয় চন্দ্রজ্যোতি ভট্টাচার্য হবিবুর দাকে এব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন " তুমি একজন ধর্মপ্রাণ ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোক হয়েও বিসর্জন ঘাটে তোমার এই সক্রিয় ভূমিকা নিতে গিয়ে কি কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে ? তিনি বলেছিলেন যে, বিষয়টি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সামাজিক দায়িত্ববোধকে প্রাধান্য দিতেই তিনি এই বিবাদের নিষ্পত্তি চেয়েছিলেন। কেননা এই বিসর্জন ঘাটের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যেরও একটা সম্পর্ক রয়েছে। সঙ্গে আরও বলেছিলেন যে ইসলাম ধর্মমতে শেষ বিচারের দিনে প্রথম যে তিন শ্রেণির লোককে বিনা বিচারে বেহেস্ত দান করা হবে তাদের মধ্যে একজন যিনি ন্যায় বিচার করেন ।এখানে , কোনো বিশেষ ধর্মের কথা বলা হয়নি । বলা হয়েছে শুধু ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা। বলতে গেলে এক অসাধ্য সাধন হয়েছিল হবিবুর দার হাত ধরেই।

স্মৃতিতে ভেসে আসছে একটি গ্রামের দৃশ্য। করিমগঞ্জ শহরতলীর একটি পিছপড়া গ্রাম উমাপতি যেখানকার ৮০ শতাংশ বাসিন্দা তফশিল সম্প্রদায়ের এবং ২০ শতাংশ মুসলিম ।গ্রামে ছিল নারাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয় জলের সুব্যবস্থা। হবিবুর দা তখন রোটারি ক্লাব অব বর্ডারল্যান্ড করিমগঞ্জ এর সভাপতি। তাঁর বিশেষ উদ্যোগে এই উমাপতি গ্রামটিকে দত্তক নেয় রোটারি ক্লাব । গ্রামের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয় বিদ্যুতের কানেকশন। বেশিরভাগ ঘরে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার পাশাপাশি গ্রামের রাস্তাঘাটের ও প্রভূত উন্নতি হয় । ঈদ, পুজো কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে অসহায় এবং দুর্গত মানুষের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেওয়া, সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচি ইত্যাদি নিয়মিত করে যায় ক্লাব টি । তাঁর কার্যকালেই রোটারি ক্লাব অব শিলচর গ্রেটারের আত্মপ্রকাশ ঘটে যা আজ বিশাল ক্লাবে পরিণত হয়েছে। হবিবুর রহমান চৌধুরী নিজের কর্ম দক্ষতা এবং নিঃস্বার্থ সমাজ সেবার দরুণ ব্যক্তি বিশেষ থেকে আজ এক প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন, এটা বললে ভুল হবে না । ২০০২ সাল থেকে তিনি সিটিজেনস্ অ্যকশন ফোরামের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ২০০৬ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত ছিলেন প্রেস ক্লাব করিমগঞ্জের সভাপতি , এখন উপদেষ্টা। ২০০৮ থেকে পুওর ডিউ একাডেমির সভাপতি হিসেবে কাজ করে আসছেন, যে সংগঠনটি মেধাবী গরিব অসহায়দের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য করে আসছে। ২০০২ থেকেই ডিস্ট্রিক্ট প্রেস ওনার এসোসিয়েশনের সভাপতি, ২০০৭ থেকেই স্বপ্নীল গ্রুপ অব স্কুল অ্যান্ড কলেজের সভাপতি, ২০১৬ থেকে এ আর সি একাডেমিক ফাউন্ডেশনের সভাপতি, ২০১৮ সাল থেকে তিনি অল ইন্ডিয়া স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম নিউজ পেপার এসোসিয়েশনের অসম প্রদেশ সমিতির সহ সভাপতির পদে রয়েছেন । ১৯৯০ থেকে ২০০৩ অব্দি ছিলেন অল আসাম স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম নিউজপেপার এসোসিয়েশনের সম্পাদক। এছাড়াও তিনি আসাম বিশ্ব বিদ্যালয়ের এডভাইসারি সমিতির সদস্য হিসেবেও রয়েছেন , রয়েছেন ন্যাশনাল সলিডিটারি অ্যান্ড ইন্ট্রিগ্রেশন কমিটি, ভারত বাংলা মৈত্রেয়ী সম্মেলন, শিলচর দূরদর্শনের রিভিউ কমিটির সদস্য (২০০২-০৫), হিউম্যানিটি ফাউন্ডেশন সহ আরও একাধিক পদে। মনে আছে, ২০১৯ সালে জাতীয় প্রেস দিবসে শিলচর বঙ্গ ভবনে বরাক উপত্যকার একমাত্র দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তাঁকে যখন সংবর্ধনা দেওয়া হয় সেদিন নিজের স্বার্থকে ভুলে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা ছিল গোটা বরাক উপত্যকা তথা অসমের সাংবাদিকদের স্বার্থে। কে না ছিলেন সেদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত। অসম সরকারের মিডিয়া উপদেষ্টা ঋষিকেশ গোস্বামী, মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য , উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কর , সাংসদ ডা. রাজদীপ রায় , প্রাক্তন মন্ত্রী কবীন্দ্র পুরকায়স্থ, তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের সঞ্চালক অনুপম চৌধুরী সহ বরাকের প্রায় সব কজন বিধায়ক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বলছিলাম , নীরব সংগ্রামের কথা । তিনি অনেক গুলো পুরস্কার জীবনে পেয়েছেন , যা অনেকের কাছে অজানা । ক'বছর আগে মুম্বাই স্থিত সমতা সাহিত্য একাডেমী তাকে ডক্টরেট ডিগ্রিতে ভূষিত করেছিল , কিন্তু কোনোদিনও তিনি নামের আগে ডক্টরেট উপাধি ব্যবহার করেননি। বরাক উপত্যকার নন্দিনী সাহিত্য ও পাঠচক্র তাঁকে নন্দিত প্রিয়জন সম্মানে ভূষিত করে। এই তো ক'দিন আগে গুয়াহাটির মাইনোরিটি ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তাকে শহিদুল আলম চৌধুরী মেমোরিয়াল এওয়ার্ড ২০২৩ দিয়ে সম্মানিত করে । প্রায় একই সময়ে সৌদি আরবের রিয়াধে অসমের এন আর আই'রা এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে সংবর্ধনা প্রদান করেন। তাছাড়াও তিনি বরাক এবং বহি বরাকের বিভিন্ন স্থানে সংবর্ধিত হন । এক ব্যক্তি একাধিক সংগঠন , অর্থাৎ এক মাথা হাজার চিন্তা নিয়ে দিব্যি আছেন তিনি। হবিবুর দা সম্পর্কে আমার জানার বাইরেও আরও কিছু থাকতে পারে , তবে যেটুকু জেনেছি আর যা দেখেছি, তা নিয়ে যদি ছোট্ট করে কিছু বলতে হয়, তাহলে বলব - এক নীরব সংগ্রামের নাম হবিবুর রহমান চৌধুরী ।

<><><><>

বাংলা নিউজ ম্যাগাজিন

বাহারুল ইসলামের চোখে হবিবুর রহমান চৌধুরি

- ডঃ কে এম বাহারুল ইসলাম -

জানাব হবিবুর রহমান চৌধুরি, যাকে আমি উনার ডাকনামে "আবুল ভাই" বলেই সম্বোধন করি, উনার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় আমার জীবনের সবচেয়ে বড় এক দুঃখজনক ঘটনার সন্ধিক্ষনে। সেটা ১৯৯১ সাল, জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ। আমি আলিগড়ে এমএ পড়ছি, শীতের ছুটিতে বাড়িতে এসেছি, নববর্ষের প্রথম দিনটির সকালেই বজ্রাঘাত, আমার আব্বা অধ্যাপক মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম উনার কর্মস্থল লালা রুবেল কলেজের পাশেই বাসায় পরলোক গমন করেছেন। রহস্যজনক পরিস্থিতিতে উনার মৃত্যু নিয়ে যপন আত্মীয়, পরিজন আর উনার অনুরাগী সবাই হতবাক, এনিয়ে মর্মাহত আর উদ্বিগ্ন, তখন করিমগর্জে উনাকে পাথারকান্দিতে দাফন করতে এসে শহরে যাদের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের মধ্যেই ছিলেন আবুল ভাই একজন। আদালতে কিছু কাজ সেরে এক মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েই পাশে থাকা নববার্তা প্রসঙ্গ সংবাদপত্রের কার্যালয়ে এক ভদ্রলোক আমাকে ডেকে নিয়ে বসালেন, কেউ পরিচয় করিয়ে দেন উনার সঙ্গে, উনিই পত্রিকার সত্বাধিকারী ও সম্পাদক হবিবুর রহমান চৌধুরি। সেই বেদনাভরা সময়ে উনার সান্ত্বনা দেয়া কথাগুলি আর মনে নেই, কিন্তু মনে আছে একজন অতি সংবেদনশীল মানুষ কিন্তু বাস্তব জ্ঞান প্রখর এমন কাউকে পাশে পেয়েছিলাম সেদিন। আব্বার মৃত্যু নিয়ে নানা খুঁটিনাটি খবর বেরিয়েছিল উনার সংবাদ পত্রের পাতায়, বিশেষ করে উনার হত্যার খবরকে বা এর সঙ্গে জড়িত সেই অজ্ঞাত ঘাতকদের আড়াল করতে হাইলাকান্দি প্রশাসন যে অপচেষ্টা করেছিল, সেসবের বিরুদ্ধে আমাদের দেয়া অনেক তথ্যই উনার পত্রিকার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছায়।

সে আজ তিন দশক আগের কথা, "আবুল ভাই" এর সঙ্গে অনেক বার দেখা হয়েছে, ধীরে ধীরে আমার একজন বড় ভাই, শুভাকাঙ্খী, এক কথায় একজন "ফ্রেন্ডফিলসফার, গাইড" হয়ে উঠেছেন। দেশের মাটিতে পা রাখলেই উনার সঙ্গে দেখা করা আর কুশলাদি বিনিময় আমার অবশ্য কর্তব্য। ইদানীং অবশ্য মুঠোফোনের মাধ্যমে বেশিরভাগ কথা হয়, দুনিয়ার যেকোন জায়গায় থাকি না কেন, নানা সমস্যার কথা উনার কাছে বলেই মন হালকা করি। ঘটনাচক্রে বছর কয়েক ধরে নতুন এক সম্পর্কে আমরা আত্মীয় হয়েছি বটে, কিন্তু আমার কাছে উনি এখনো সেই আবুল ভাই রয়ে গেছেন। এহেন মানুষের বিষয়ে লিখতে বসে মহা সমস্যায় পড়তে হলো, এত কথা স্মৃতির রাজ্য থেকে হুড়মুড় করে এসে মনের দরজায় ভিড় করল যে কি লিখি আর কি বাদ দিই, এনিয়ে কলম আর এগোয় না। যাইহোক, মানুষ হবিবুর রহমান চৌধুরি হিসাবে যে কথাগুলি আমার মনে দাগ কেটেছিল, বা যে ভাবে উনাকে এতদিন আমি দেখেছি সে নিয়ে কটা কথা এখানে উপস্থাপন করতে চাইছি।

২০০৭ সালের কথা, তখন করিমগঞ্জে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভোট গণনা চলছে করিমগঞ্জ কলেজে। উপরতলার গণনা হলের পাশে এক রুমে আমাদের সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের বসার জায়গা করা হয়েছে, এখানে বসেই আমরা গণনার খবর নিচ্ছি, নিজ নিজ দলের প্রার্থীদের হার জিতের উপর নজর রাখছি। সেখানে তখনকার আমার দলের জেলা সভাপতি আব্দুল মালিক চৌধুরী, কংগ্রেসের জেলা সভাপতি সতু রায় মহাশয়, প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আবু সালেহ নজমুদ্দিন সাহেব সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রথম সারির নেতৃবৃন্দরা বসে আছে, বিভিন্ন সাংবাদিকরাও এসে আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন। আবার পাশের একটি রুমে আমরা ক'জন যথাসময়ে নামাজ পড়ে নিচ্ছি। আমার জন্য এটা খুবই নতুন এক অভিজ্ঞতা বলতে হবে, পঞ্চায়েত ওয়ার্ড সদস্যরা মুষ্টিমেয় কটা ভোটের জন্য হারছেন, কেউ বা জিতছেন। কেউ হতাশায় ভেঙে পড়ছেন আর কেউ সগর্বে বিজয় মিছিল নিয়ে কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। শেষের দিকে কালিগঞ্জের এক জেলা পরিষদ সদস্যের ভোট গণনা নিয়ে খুবই আপত্তি উটল, যানা গেল ভোটে জিতে যাওয়া এক নির্দল প্রার্থীকে হিসাবের গণ্ডগুল করে হারিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের দলের প্রার্থী না হলেও এই অন্যায় মেনে নেওয়া যায় না, দলীয় স্বার্থের উর্দ্ধে উঠে আমরা কয়েকজন ভীষণ আপত্তি জানালাম। গণনা কেন্দ্রে উপস্থিত হবিবুর চৌধুরি প্রথমে বাস্তবতা যাচাই করে পরক্ষণেই গর্জে উঠলেন, ফোন করলেন তখনকার জেলাশাসক তথা রিটার্নিং অফিসার শ্রী অনুরাগ গোয়েলের কাছে যিনি বর্তমানে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক। একটানা দুদিন গণনা কাজে ব্যস্ত থাকায় খানিকটা জ্বরে কাবু হয়ে ততক্ষণে বাংলোয় চলে গেছেন, খবর পেয়ে শীতবস্ত্র গায়ে জড়িয়ে পুনরায় গণনা কেন্দ্রে এসে হাজির হলেন গোয়েল সাহেব। দেখা গেল ভোট গণনার মূল হিসাবে যোগ করতে গিয়ে (হয়তবা ইচ্ছাকৃত ভাবে ?) ভূল করা হয়েছে। উনি কিছুক্ষণের মধ্যেই যোগফল ঠিক করে নিয়েই নির্দল প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করে দিলেন। অল্প আগে যাকে পরাজিত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, তাকেই আবার জয়ী বলে ঘোষণা করলেন রিটার্নিং অফিসার। ভোট গণনা নিয়ে এই বাদানুবাদের সময় যখন সবাইব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তখন আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন দলের অনেকেই। এব্যাপারে যখন সব রাজনৈতিক দলের নেতারা নানা মতামত দিচ্ছেন তখন লক্ষ্য করলাম, জেলাশাসক অনুরাগ গোয়েল উনাকে "হবিবুর দা' বলে সম্বোধন করছেন, অথচ

অন্যান্য নেতাদের যেমন "অমুকজি, তমুকজি' বলেই কথা বলছেন। ব্যাপারটা আমার অনেকটা অবাক লাগে কারণ আইএএস অফিসাররা সাধারণতঃ সবার থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখতে গিয়ে ফর্মাল কথাবার্তা বলেন। হবিবুর চৌধুরির জন্য এই ব্যতিক্রম কেন? পরে জানতে পারি যে এই জেলায় বা রাজ্যে এরকম অসংখ্য অফিসার আছেন যাদের সঙ্গে উনার এরকমই ব্যক্তিগত সম্পর্ক। আসলে উনার সঙ্গে যারাই কোনো কারণে ঘনিষ্ঠ হয়েছেন তারাই উনার সঙ্গে এক মধুর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন। হবিবুর ভাইয়ের কথায় এক আন্তরিকতার ছোঁয়া, নির্ভেজাল সোজা সাপ্টা মতামত দেয়ার নির্ভীক সাহস আছে, যেটা সবাইকে উনার কাছে টানে, অন্তত যারা সত্যিকারের মতামত, উপদেশ বা সঠিক সমালোচনার কদর করেন।

বেশিরভাগ সময়ই আমরা আশা করি, যেভাবে বন্ধুত্ব পালন করছি আমার বন্ধুও সেভাবেই আমাদের সাথে বন্ধুত্ব পালন করবে, অর্থাৎ আমাদের সব কাজে সমর্থন করবে। কিন্তু সত্যিকার বন্ধু সেই যে আমাদের যথারীতি সমালোচনা করবে, যাতে আমরা সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। দু'জন মানুষের সাময়িক দেখা সাক্ষাৎ বা কিছুদিনের বন্ধুত্ব হতেই পারে, আর সময়ের সাথে এই ঘনিষ্ঠতাও বদলে যেতে পারে। কিন্তু হবিবুর ভাইয়ের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে মতবিরোধ হয়েছে, কোনো কারণে এমনকি কোনো বিষয় নিয়ে ঝগড়াও হয়েছে, কিন্তু উনার কথা গঠনমূলক হয়, আমাদের কোন ব্যাপারে সম্পূর্ণ এক অন্য দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোনো বিষয়কে চিন্তা করতে বাধ্য করে। তাই উনার সঙ্গে মানুষের সম্পর্কে ঘনিষ্ঠতার টান লেগে যায় প্রথম থেকেই, যেমন সেই রাত্রে অনুরাগ গোয়লের সম্বোধন থেকে আমি বুঝতে পারি। সমাজের বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য মানুষের সঙ্গে উনার যে বিশাল পরিচিতির ব্যাপ্তি, সেটা উনার সৎ প্রতিক্রিয়া দেয়ার যে অকপট অভ্যাস সেটাই উনাকে সবার আপনজন করে তোলে। কেবল শ্রী অনুরাগ গোয়েলই নন, আমার জানা এবং দেখা মতে সরকারি আধিকারিক বিশেষ করে প্রশাসনিক আমলাদের মধ্যে অনেকেই যেমন গুয়াহাটির বর্তমান পুলিশ কমিশনার দিগন্ত বরা, প্রাক্তন ডিজিপি মুকেশ সহায়, কাছাড়ের ডিসি গৌতম গাঙ্গুলি, গোকুল মোহন হাজারিকা, লক্ষ্মনন এস, করিমগঞ্জের ডিসি জনস্ ইংতি কাথার, দেবেশ্বর মালাকার, সঞ্জীব গৌহাই বরুয়া, মনোজ ডেকা, ড° ভূপেন শর্মা সহ আরো অনেকেই উনার নৈকট্য লাভ করে আজও এক মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে আছেন। হাইলাকান্দির একসময়ের ডিসি সোমা থিয়েকের ঘনিষ্ঠরা 'More than brother' বললে হবিবুর চৌধুরিকেই চিনতেন। কাছাড় করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার প্রদীপ কর তাকে "ভাইজান" বলে সম্বোধন করতেন। অবশ্য এসবের কিছুটা কারণও ছিল, কোনো বিশেষ ইশ্যু নিয়ে যখনই কোনো সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দিত তখনই তিনি এর সুরাহায় সংশ্লিষ্ট এলাকার দল মত, ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের লোককে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।

এটা বলাই বাহুল্য যে হবিবুর রহমান চৌধুরি তাঁর নিঃস্বার্থ প্রকৃতি এবং খোলা মনের কথার মাধ্যমে আমাদের এই সমাজের অনেক মানুষের মননে এক সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। আমার প্রায়ই মনে হয়, তিনি শিক্ষার এক রূপান্ত রমূলক প্রকৃতিতে বিশ্বাস করেন এবং অধিকাংশ সময় নানা সামাজিক কাজে উনাকে শামিল হতে দেখা যায়। আমরা যখন এমন এক যুগে বাস করছি যেখানে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করে পদ্ধতিগত এবং সামাজিকভাবে চিরাচরিত পেশায় যোগ দেয়াই প্রায় সবার লক্ষ্য, সে জায়গা থেকে উনি করিমগঞ্জের মতো এক প্রান্তিক অঞ্চলে সংবাদ সেবার চ্যালেঞ্জিং কাজে কয়েক দশক আগে থেকেই দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন বলতে হবে। আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক নানা প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করেও যে সংবাদ সেবার জগতে ইন্টারনেটের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে তিনি এই জেলার যে এক পরিচয় তোলে ধরার কথা ভেবেছিলেন, সেটা ব্যবসায়িক বেলেন্স শিটের বাইরের কোন খতিয়ানে ইতিহাসের পাতায় নিশ্চয় তোলা থাকবে। সেই জায়গায় যে কিছু করার আছে তিনি এটিকে একটি নববার্তার ডিজিটাল চেনেল "নববার্তা টুডে" সব মিলিয়ে নানা স্বপ্নের উড়ন্ত রঙে সে লক্ষ্য পূরণ হয়েছে বলতে হবে। এর জন্য কিন্তু তাকে অনেক ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে। মনে আছে ১৯৯২ সালের একটি ঘটনা। প্রখ্যাত শীর্ষক প্রাবন্ধিক আব্দুল খালিক বাঙ্গাল বি আর আম্বেদকর পতনাবলীর উদ্ধৃতি দিয়ে 'রাম রাজত্বের অন্তরালে প্রকৃত কাহিনী' একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন অর্ধসাপ্তাহিক নববার্তা প্রসঙ্গে। স্বনামধন্য পুলিশ অফিসার পল্লভ ভট্টাচার্য তখন করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সে সময়, এক নাগাড়ে ৮দিন মেইন রোডস্থ নববার্তা প্রসঙ্গ কার্যালয়ের সম্মুখে পুলিশ প্রহরা পর্যন্ত বহাল রাখতে হয়েছিল প্রশাসনকে।

তবে আমার মতো অনেকের কাছে হয়ত হবিবুর সাহেবের সবচেয়ে বড়ো পরিচয় যে, তিনি সারা জীবন জুড়ে আমাদের জন্য এক "বাতিঘর, স্বরূপ দাড়িয়ে আছেন। তিনি নিজে নানা অনিশ্চয়তা এবং অশান্তির সময়ে আমাদের এই এলাকার অনেকের জন্য যেন কোথাও এক জায়গায় স্থিতধী হয়ে দাড়িয়ে আছেন, আর যারাই কোন উত্তাল সময়ে, অশান্ত বাতাবরণে দিক ভ্রান্ত হয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েন তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে এগিয়ে যাবার সাহস যোগান। উনি হচ্ছেন যেন সেই ভরসার ঠাঁই, যিনি চিরকাল আমাদের সাথে থাকবেন এবং ক্রমাগত আমাদের আশা যোগাবেন। আর আমাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করতে করতে নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাব এবং আমরা জানি কোন সুপরামর্শ নিতে হলে হবিবুর ভাই পাশে ছিলেন, আছেন ও ভবিষ্যতেও থাকবেন।

একজন সত্যিকারের শুভানুধ্যায়ীর সবচেয়ে বড় লক্ষণ হলো উনারা আমাদের সব কথায় সায় দেন না, আমাদের সব ইচ্ছেকেই অন্ধভাবে সমর্থন করেন না। অনেক সময় তারা আমাদের বাধা দেন, কোনো কাজে বারণ করেন, এমনকি কখনো উনাদের কড়া কথা খারাপ লাগতেও পারে। হবিবুর ভাই এই মাপকাঠিতে পুরো মার্কস পাবেন। অন্তত আমার জীবনে দু-একটা বড় পদক্ষেপ নেয়ার সময় উনি বাধা দিয়েছিলেন, বা বলা যায় সেকাজে উনার পুরো সায় ছিল না। বিখ্যাত কবি, ব্যঙ্গশিল্পী ও দার্শনিক আলেকজান্ডার পোপ এক কবিতায় লিখেছেন: **"বোকারা সেখানেই ছুটে যায়, যেখানে ফেরেশতারা পা রাখতে ভয় পান"**। আমিও জীবনে অনেক সময় এরকম অনেক দিকে ছুটে গেছি যেখানে হয়ত ফেরেশতারাও যাবার আগে দুবার চিন্তা করবেন। এরকমই এক সময় ছিল যখন একবার দেশে ছুটিতে এসে নির্বাচনে অবতীর্ণ হই। হবিবুর সাহেব কিন্তু এব্যাপারে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, কিন্তু তখন আমি ইতিমধ্যেই পা বাড়িয়ে ফেলেছি। যারা আমার উপর ভরসা করেছেন আমি তাদের নিরাশ করতে চাইনি। আজ পিছনে ফিরে তাকালে দেখি উনার কথাগুলি অনেকাংশেই সত্য হয়েছিল। তবে একবার ময়দানে নামার পর উনি আর পিছনে টেনে ধরেননি, যখন যে সাহায্য চেয়েছি, সেটা তিনি উজাড় করে দিয়েছেন। উনার সঙ্গে এরকম বিভিন্ন বিষয়ে আমার বিপরীত মেরু থেকেও আলোচনা হয়, অনেক সময় আমাদের মতানৈক্য হয় কিন্তু কোনোদিন মনান্তর হয়নি। আমার মনে আছে, তিনি কীভাবে কিছু দৃঢ় সিদ্ধান্তের সাথে লড়াই করতেন, সেগুলিকে এমনভাবে জোরালো ভাবে তুলে ধরতেন, তার বক্তব্যের সারমর্মের সাথে আপস করতেন না। আমি তার উৎসর্গ এবং সংকল্প দেখেছি, উনার ভাষার শক্তিও বুঝতে পেরেছি। সেটা আমার কাছে কম লাভ নয়।

উল্লেখযোগ্যভাবে, হবিবুর ভাইয়ের অভিধানে "জেনারেশন গ্যাপ'-এর মতো কোনো শব্দ নেই বললেই চলে। আমাদের প্রজন্মের লোক (আশি নব্বইয়ের দশক) হয়েও এমনকি এই ডিজিটাল অগ্রগতির বছরগুলিতেও, তিনি সর্বদা সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আছেন এবং নতুন যুগের প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে অনেকটাই সক্ষম।

এতদঞ্চলের সংবাদপত্র অফিসে বা প্রেসগুলিতে কম্পিউটারের প্রচলন আসার অনেক আগে থেকেই এনিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেন, প্রায় এসব বিষয়ে কথা হতো। বলা যায়, আমাদের জেলায় আধুনিক সংবাদপত্রে বা সংবাদসেবায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি এক পথিকৃৎ। তাঁর পেশাদার সিঁড়িবেয়ে ধাপে ধাপে শীর্ষে ওঠার নিজস্ব বাস্তব জীবনের গল্প সত্যিই আকর্ষণীয়। মাঝে মধ্যে তাঁর নিজের কথায়, উনার কাছ থেকে সেগুলো শোনেছি। তবে কারো কাছে তিনি একজন সমাজসেবী, কারো কাছে বিপদে আপদে মানুষের বন্ধু। বিয়ে বাড়ি, শ্রাদ্ধবাড়ি, কবরস্থান কিংবা শ্মশান সর্বত্রই তিনি উপস্থিত। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হয়ে সমাজের নিঃস্বার্থ সেবায় নানা কাজ করে যাচ্ছেন। এলাকার সকল ভালো কাজে অংশ নেওয়াটা তাঁর যেন একমাত্র ব্রত। আর এভাবেই শতশত ভালো কাজে অংশ নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এই পরিসরে সব কিছু বলা সম্ভব নয়। করিমগঞ্জ তথা জেলার বাইরের অনেকেই জানেন উনি সমাজ ও মানুষের কল্যাণে জড়িত, সমাজসেবামূলক এমন কোনো কাজ নেই যেখানে উনার অংশ গ্রহণ নেই। করিমগঞ্জ তথা উপত্যকার শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক মঞ্চ ইত্যাদিতেও তার উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদেরকে আকৃষ্ট করে। এমনকি ক্রীড়া জগতেও তার বিচরণ পরিলক্ষিত হয়। প্রায় কুড়ি বছর ধরে স্বাধীনতা ও প্রজাতন্ত্র দিবসে করিমগঞ্জ ডিএসএ ময়দানে মাইক্রোফোন হাতে ফুটবল ও ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায়ও তাকে দেখতে পাওয়া যায়। স্কুল কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটির সভাপতি/সদস্য হিসেবেও নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। আর এ সবকিছুই বেশিরভাগ তার নিজ অর্থায়নে ও উদ্যোগে করা। স্থানীয় প্রেসক্লাব, রোটারি ক্লাব সহ আরো বেশ কয়েকটি সামাজিক সংগঠনে রয়েছে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

আমার ব্যক্তিগত সম্পর্কের বাইরে, এই জেলার এক সুপরিচিত নাগরিক সমাজের অগ্রণী হিসেবে হবিবুর রহমান চৌধুরি অনেকদিন থেকে কাজ করছেন। তিনি আরো দীর্ঘদিন সমাজ ও দেশের জন্য কল্যাণকর কাজ করে যাবেন, মহান স্রষ্টা কাছে এই প্রার্থনা করি। উনার কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আরো অনেকে বিভিন্ন সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসবেন এই প্রত্যাশা রইল। জীবৎকালে আমরা সাধারণতঃ মানুষকে সেভাবে সম্মান দিই না, সে দিক থেকে বিবেচনা করে যারা উনাকে নিয়ে ব্যতিক্রমী ধরণের এই প্রকাশনার উদ্যোক্তা, তাদেরকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

<><><><><><>

লেখক পরিচিতি: অধ্যাপক কে এম বাহারুল ইসলাম যোগাযোগ, উন্নয়ন, জননীতি এবং শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে তিন দশকেরও বেশিসময় ধরে কাজ করছেন। বর্তমানে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট কাশিপুরের সেন্টার ফর পাবলিক পলিসি জ্যান্ড গভর্নমেন্টের প্রধান অধ্যাপক চেয়ার পার্সন। এছাড়াও তিনি লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সের ভিজিটিং প্রফেসর। তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন এবং জাতিসংঘের সাথে বিভিন্ন কার্যভারে দায়িত্ব পালন করেছেন। অধ্যাপক ইসলাম দুটি পিএইচডি, এমএ, এমবিএ, এলএলএম এবং বিএড করেছেন। তাছাড়া তিনি ব্যাংককের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা করেন। তিনি সম্প্রতি কুমায়ুন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি শিক্ষণ নিয়ে ডি-লিট ডিগ্রি লাভ করেছেন। তিনি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়, তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বিলাতের স্ট্যাথ ক্লাইড বিশ্ববিদ্যালয়, হার্ভার্ড বিজনেস স্কুল এবং সুইজারল্যান্ডের বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। এছাড়াও তিনি গ্রেট ব্রিটেনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডি, সিমলা, এবং ওয়াশিংটন ডিসির ইউএস ইন্ডিয়া পলিসি ইনস্টিটিউটের একজন ফেলো। তার বেশ কয়েকটি বই এবং গবেষণা নিবন্ধ রয়েছে।

কখন অন্য মনে

- সুনির্মল বসু -

সুচরিতাসু, আজ বহুদিন বাদে তোমাকে চিঠি লিখছি। নাহ, কথাটা ভুল বললাম। চিঠি তোমার উদ্দেশ্যে আমি অনেক লিখেছি। কিন্তু সেই চিঠি তোমাকে পাঠানো হয়নি।

আমার বালিশের নিচে অথবা তোষকের তলায় সেই চিঠি রয়ে গেছে।

আজ বিকেলে আকাশে খুব মেঘ করেছিল। সন্ধ্যে থেকে প্রবল ঝড় শুরু হয়েছে। আমার জানালা দিয়ে দেখছি, ঝড়ে তাল সুপুরি গাছের মাথাগুলো দুলছে।

বাঁশবনে বোধহয় একটা সাপে ব্যাঙ ধরেছে। ঘরে বসে ব্যাঙটার আর্ত চিৎকার শুনতে পাচ্ছি।

রবি ঠাকুরের কবিতা মনে পড়ছে, আমি পরানের সাথে খেলিব আজিকে মরণ খেলা, নিশীথ বেলা। এই বাদল ধারা আমাকে কেমন স্মৃতিমেদুর করে তুলেছে।

মনে পড়ে অনুরাধা, তুমি যখন দুপুরের রোদে কলেজ থেকে ফিরতে, তখন দূরের ল্যাম্পপোস্টের নিচে দাঁড়িয়ে আমি আনমনে সিগারেট টানতাম। এভাবেই একদিন আলাপ।

- আপনি এভাবে প্রতিদিন রোদে দাঁড়িয়ে থাকেন কেন?

আমার মুখে কোনো কথা নেই।

- বুঝেছি।

- কি ?

- আপনি আমাকে ভালোবাসেন।

- বাসি তো,

- জানি,

- আপনি তো বঙ্গবাসী কলেজে বাংলায় অনার্স পড়েন, পত্রিকায় কবিতা লেখেন।

- হ্যাঁ, আপনি জানলেন কি করে ?

- জানতে হয় মশাই, আমাকে আপনার কবিতা পড়াবেন তো ?

- হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আপনি পড়তে চাইলে অবশ্যই দেবো।

- আমাকে আর আপনি বলা যাবে না।

- মানে!

- এখন থেকে তুমি বলতে হবে। এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা চলবে না, যোগ্য হতে হবে।

- তুমিও তাহলে আমাকে আর আপনি বলোনা।

- ঠিক আছে, সপ্তাহে দুই দিন দেখা করলেই চলবে।

- তাই।

- হ্যাঁ, আমি ফোনে কথা বলে নেবো, আজ চলি।

সেই প্রথম আলাপ দুজনের। অনার্স পাশ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ পড়ছি তখন, চাকরির চেষ্টা করছি। তুমি বললে, বাড়ি থেকে তোমার জন্য পাত্র দেখা চলছে। তারপর বহরমপুরের সম্ভাবনাময় ডাক্তার অনুভব মুখার্জির সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বিয়েতে তুমি আমাকে নেমন্তন্ন করেছিলে, আমি তোমার বিয়েতে গিয়েছিলাম। শুভদৃষ্টি মালা বদলের মধ্যে দিয়ে তুমি পর হয়ে গেলে অনুরাধা। যেহেতু তোমাকে ভালোবেসেছিলাম, তাই আর কাউকে ভালবাসতে পারিনি কখনো। সুনীল গাঙ্গুলীর কবিতা আমার বড় প্রিয়। সুনীলদার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত আলাপ ছিল। আমি আবৃত্তি করতাম, এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ, আমি কি এ হাতে কোনো পাপ করতে পারি, এই ওষ্ঠ বলেছে নীরাকে ভালোবাসি, এই ওষ্ঠে এত মিথ্যা কি মানায় ?

এরপর স্কুলে চাকরি পেলাম। আমার প্রথম উপন্যাস শিকড়ে বৃষ্টির শব্দ বের হোল। সিনেমা তৈরি হলো। প্রথম কবিতার বই বের হলো, ভালোবাসার কবিতা মালা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমার গল্প কবিতা প্রকাশিত হতে থাকলো। আর, আজ সন্ধ্যায় খবরে ঘোষণা হল, সাহিত্যে অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের কথা। অনু, অনুরাধা, আমার ভাগ্যটা যেন কেমন। একসময় যা গভীর করে পেতে চেয়েছিলাম, সেদিন ঈশ্বর শূন্য হাতে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। আর আজ, এতসব তো আমি চাইনি। আমি তো অল্পে খুশি একটা জীবন চেয়েছিলাম। না চাইতে আজ সব হাতের মুঠোয়। সকাল থেকে প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে লোকজন এসেছিল সাক্ষাৎকার নিতে। জিজ্ঞেস করছিল, লেখার প্রেরণা কে, আমি বলেছি, আমার দুর্ভাগ্য। জীবনে যা যা পাইনি, অথচ পেতে চেয়েছিলাম, সেগুলোই আমার লেখায় বারবার ফিরে ফিরে আসে। জীবনের সার্বিক পরাজয়, এত হার,এত কান্না, আমার লেখার প্রেরণা। হয়তো কখনো কখনো আমার লেখায় তুমিও এসেছো, তবে সেটা তুমি নও, অবিকল হয়তো তোমার ছায়া, জানো অনুরাধা, আমি একটা ছায়া জীবনের ঘোরের মধ্যে বেঁচে আছি। কারো জীবনের সঙ্গে অন্যের জীবন কখনো মেলে না জানি, কিন্তু আমার জীবনটা যেন কেমন। গুছিয়ে লিখি বটে, কিন্তু জীবন আমার একেবারেই আগোছালো। তবু আজ এই সুখের দিনে, এই মেঘমেদুর স্মৃতিময় দিনে একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে, তুমি কি আমায় ভুলতে পেরেছো, গড়িয়া হাটের বিকেল সন্ধে গুলোর কথা কি মনে পড়ে তোমার, মনে পড়ে, বসুশ্রী হলে উত্তম সুচিত্রার সিনেমা দেখা, পথে দাঁড়িয়ে ফুচকা খাওয়া, লেকের পাড়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় বসে জলের ঢেউ গোনা, ঘনঘন বই পাল্টানোর নাম করে লাইব্রেরীর মাঠে দেখা করা। অনুরাধা, আমাদের গেছে যে দিন, একেবারেই কি গেছে। বাইরে বৃষ্টির দাপট আরও বেড়েছে। বাঁশবনে মর্মর ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। ঝড়ে মনে হয়, বাবলা গাছের ডাল ভেঙে পড়লো। অনুরাধা, এত সাফল্য আমি তো কোনোদিন চাইনি, আমি শুধু তোমাকে পেতে চেয়েছিলাম। মির্জা গালিবের কবিতা মনে পড়ছে, "তুম না আওগে তো মরনে কিও শ ও তদবীরে, মৌৎ কুছ তুম তো নেহি হো কি বুলা ভি না সকু।" মানে কি জানো, তুমি না এলে একশো ভাবে মরণকে ডাকতে পারি, মৃত্যু তো তোমার মত কঠিন হৃদয় নয়, যে ডাকলেও সে আসবে না। অনু, এখন অনেক রাত। দূরের গীর্জার ঢং ঢং ঘন্টা বাজল, শেষ প্রহরের। আমার ঘুম পাচ্ছে খুব। এবার শুতে যাবো। আজ আর তোমাকে ভালোবাসা জানাবার অধিকার আমার নেই, তাই প্রীতির পরশ জানিয়ে আমার বক্তব্যের বিরতির রেখাকে ইতির সময়সীমায় বেঁধে দিচ্ছি। তুমি ভালো থেকো অনু, আমাকে ভুলে যেও অনুরাধা। ইতি।

<><><><><>

মনস্তাত্ত্বিক

- রীতা চক্রবর্তী -

আজকাল সকাল ছ'টার আগেই ঘুম ভেঙে যায় রাইয়ের।আসলে ঠিক ছ'টাতেই ওর কাজের মাসি এসে দরজায় বেল বাজায়, তাই ওকেও উঠে পড়তে হয় সেই সাত সকালেই। আজো তার ব্যতিক্রম হলো না। তবে আজ যেনো রাইকে এক তন্দ্রা জড়ানো আলস্যতায় পেয়ে বসেছে। দরজায় বেল বাজতেই কোনোরকম বিছানা ছেড়ে উঠে দরজাটা খুলে দিয়েই আবার বিছানায় এসে আশ্রয় নিলো রাই। আজ ওর জীবনে একটি বিশেষ দিন,এমনি বিশেষ দিনগুলোতেই আসলে ও একেবারে মুষড়ে পড়ে।ওর শক্ত মনের আগল ভেঙে শুভ এসে ঢুকে পড়ে স্মরণে মননে আর বেদনাবিধুর হয়ে ওঠে ওর মন।এমনি স্মৃতি-মেদুর দিনগুলোতেই রাই যেনো আরো বেশি বিচলিত হয়ে ওঠে শুভর বিচ্ছেদ যন্ত্রনায়।তবু যদি ছেলেটা কাছে থাকতো আজ! ছেলেটার জন্যও খুব মন কেমন করছে রাইয়ের, কিন্তু ছেলে অভি যে এখন আসতে পারবে না, সে তো জানেই রাই। সামনে অভির সেমিস্টারের এক্সাম আছে ,তাই ওর পক্ষে তো এখন কিছুতেই আসা সম্ভব নয়। অবশ্য ওর সঙ্গে আজ অসংখ্যবার ফোনে কথা বলবে অভি।

আজ রাইয়ের জন্মদিন।মনে পড়ে ওর,প্রতিবার জন্মদিনেই ও বেঘোরে ঘুমোতো আর শুভ ভোরবেলা জেগে উঠে চুপিচুপি রাইয়ের বন্ধ চোখের পাতায় আলতো চুমু খেয়ে কানের কাছে মুখ নামিয়ে ফিসফিস করে বলতো - "শুভ জন্মদিন মাই সুইট হার্ট"! প্রতি বছর প্রথম শুভেচ্ছাবার্তাটি শুভর কাছ থেকেই পেতো রাই।কিন্তু আজ আর কেউ ওকে ঘুম ভাঙিয়ে শুভেচ্ছা জানায়নি। তবে রাই জানে বেলা বাড়লে আত্মীয়-স্বজন ,বন্ধুবান্ধব সকলেই ফোন করে ওকে শুভেচ্ছা, শুভকামনায় ভরিয়ে তুলবে ,তখন চোখের জল লুকিয়ে সকলের সঙ্গে হয়তো কিছুটা সময় অন্যমনস্ক হয়ে কাটিয়ে দেবে কিন্তু....না আর ভাবতে ভালো লাগছে না রাইয়ের।অসময়ে ছেড়ে যাওয়া শুভর উপর ওর হঠাৎ করে কেমন যেনো এক অভিমান উথলে উঠলো।রাই ভাবলো, আজ ও আরো পাঁচটি দিনের মতোই নানা কাজের মাঝে নিজেকে ব্যস্ত করে রাখবে।অবশ্য যা ওর সংসারের শ্রী!! কাজ তো নয় এটা সেটা নাড়াচাড়া করেই দিন কাটিয়ে দেবে ভেবে বিছানা থেকে নেমে পড়লো রাই।বাইরে বেরিয়ে দেখলো আজ আকাশ একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার। বৈশাখের মাঝামাঝি এ সময়টাতে মেঘের আনাগোনা না থাকলে সুনীল আকাশ তাঁর পূর্ণ উত্তাপ নিয়ে একেবারে ঝলমলে হলুদ রঙের প্রখর রোদ ঢেলে দেয় পৃথিবীর বুকে। ও মনে মনে ভাবলো আজ একটু ছাদে বিছানা পত্তরগুলো শুকিয়ে নেবে। অনেকদিন এ কাজটা করা হয়নি। আসলে রাইয়ের এখন সংসারের কোনো কাজেই মন বসে না।বেঁচে আছে বলে যতটুকু না করলেই নয় ঠিক ততটুকুই করে ও। এইটুকুনতো ভাঙা সংসার, কিইবা করার আছে ওর! একমাত্র ছেলে অভি দক্ষিণের একটি রাজ্যে কারিগরী শিক্ষায় পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে, সবে তৃতীয় বর্ষ চলছে, শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে আরো একবছর বাকী। শুভ যেদিন ওকে একা ফেলে রেখে চলে গেলো অজানার পথে, সেদিনই রাই বুঝতে পেরেছিল, ছেলের শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ওকে একলা পথেই পথ চলতে হবে।

না, রাই অতীতকে ভুলতে চাইলেও অতীত ওকে সব সময় ছুঁয়ে থাকে। আজ রাই বারেবারেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে।ও জানে, মনস্তাত্ত্বিক টানের অসীম ক্ষমতা, এভাবে ভাবলে তো ছেলেটাও দূর দেশে অস্থির হয়ে উঠবে মায়ের জন্য!মা ছেলের টান যে নাড়ির টান!এমনি সব এলোমেলো ভাবনার মাঝে হঠাৎ দুপুরে কালো কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাঁকিয়ে কালবৈশাখী ঝড় উঠলো আকাশ জুড়ে। আকস্মিক এতটাই প্রবল ঝড় উঠলো যে রাই ছুটে ছাদে গিয়ে বিছানা-পত্তর নামিয়ে আনতে আনতেই সমস্ত ঘরের মেঝে, আসবাবপত্র ধূলোয় ধূলোময় হয়ে গেলো। রাই ছুটে ছুটে দরজা জানালার আগল তুলতে তুলতেই কোথাও মর্মর শব্দে একটি গাছ ভেঙে পড়লো। এবার শব্দকে অনুসরণ করে ছুটে এসে দেখলো ওদের বাড়ির একটি সুপুরি গাছ ভেঙে পড়েছে দেয়ালের গা ঘেঁষে। 'যাক বাবা কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি যে এটাই যথেষ্ট'। মনে মনে স্বগোক্তি করলো রাই। ধীরে ধীরে একসময় ঝড় থামলো কিন্তু রাইয়ের মনের ঝড় বয়েই গেলো সারাটি দিন জুড়ে।

রাই আজ একটু বেশিই আবেগিক হয়ে উঠেছে। সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকলেও, মনটি ওর বড় অস্থির
হয়ে আছে আজ ছেলেটি কাছে না থাকাতে। সম্পর্কের টানাপোড়েনের হিসেব কষতে গিয়ে রাই ভাবে, ওর এই ছোট্ট জীবনে অনেক পাওয়া হারানোর ভিড়ে, অনেক সহজ-কঠিন সম্পর্কের আসা যাওয়ার রাস্তায়, যে ক'টা সম্পর্ক সবচেয়ে বেশি ছাপ রেখে গেছে ওর মনে তারমাঝে এই সম্পর্কটিই সবচেয়ে বেশি মূল্যবান সম্পর্ক। কারণ ছেলের জন্ম ওর জীবনকে পূর্ণতা দিয়েছে। মা হয়ে ওঠার থেকে বড় অনুভূতি হয়তো আর কিছুই নেই পৃথিবীতে।আর এক মা হিসেবে রাইয়ের প্রত্যাশা এতটুকুই যে জীবনের সব ভালোটুকু দিয়েই যেনো অভি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ওর সব সদিচ্ছেগুলো যেনো পূর্ণতা পায়।তাছাড়া আজ আর রাইয়ের জীবনে চাওয়া পাওয়ার কিছুই নেই।

গতকাল রাত বারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই অভি ফোনে মা'কে উইশ করেছে, আর ওকে বারবারই বলেছে, ক'দিন বাদেই অভি আসছে তখন একদিন মা ছেলেতে জমিয়ে জন্মদিনের পার্টিটা করে ফেলবে।আজ যেন রাই একটুও মন খারাপ না করে। ও আরো বলেছে, আগামীকাল ওদের কলেজ থেকে একটি আউটডোর ইভেন্টে নিয়ে যাচ্ছে, ফিরতে ফিরতে রাত হবে, তবে যদি সুযোগ পায় অভি অবশ্যই মাঝে মাঝে ফোন করে মায়ের সঙ্গে আড্ডা দেবে। রাই অবাক হয়েছিল অভির কথাগুলো শুনে, এইতো সেদিনের সেই একরত্তি ছেলে কতভাবেই না চেষ্টা করে মায়ের মনকে ভুলিয়ে রাখতে, পরিস্থিতির চাপে পড়ে আজ কতটা সাবলম্বী হয়ে উঠেছে অভি!কথাগুলো ভাবতে ভাবতে রাইয়ের দু'চোখের পাতা আবার জলে ভিজে উঠলো।টপটপ করে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো চিবুক বেয়ে।

এভাবে কথার পৃষ্ঠে কথার মালা গেঁথে গেঁথেই রাইয়ের বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে নামলো। সাঁঝবেলা রাই তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে ছাদে চলে গেলো। দুপুরের কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে বিদ্যুৎ যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে আছে তখন থেকে।ঝড় থামার পর বৃষ্টি না হওয়াতে গোমট গরম বোধ করছে ও। সারাদিন পাখা চললেও এখন আর ইনভার্টার টানতে পারছে না। তাছাড়া রাইয়ের মন খারাপ হলেই ও ছাদে চলে যায়,তারাদের সঙ্গে সময় কাটায়।খুব ভালো লাগে ওর, দূরে বিষন্ন একাকী মিটমিট করে জ্বলতে থাকা কোন একটি তারার সঙ্গে কথা বলতে। তখন যেনো ওর মনে হাজারো কথারা এসে ভিড় করে।আজ রাই দেখলো আকাশ জুড়ে একটি সোনাগলা রঙের আস্ত

চাঁদ আকাশে শোভা পাচ্ছে। আজ কী তবে পূর্ণিমা!হিসেব কষে দেখল আজ নয় আগামীকাল পূর্ণিমা। সোনালী চাঁদের পানে তাকিয়ে রাই হঠাৎ গুনগুন করে গেয়ে উঠল,'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে...' সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়লো,এ গানটা শুভ খুব ভালোবাসতো। বলতো, 'খুব প্রিয় রবীন্দ্র সংগীত আমার। ছলছল চোখে রাই গানটি গুনগুন করছে আর ভাবছে বহুদিন তানপুরাটা ছুঁয়ে দেখা হয়নি, ক'দিন বাদে হয়তো তানপুরার তারেই জং ধরে যাবে। ভাবতে ভাবতে নিচে নেমে এলো ও। ঘরে এসে ঘরের লাগুয়া ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো জ্যোৎস্নালোকে চারপাশ মায়াবী আলোয় ভেসে যাচ্ছে। নারকেল সুপুরী গাছগুলো জ্যোৎস্নাস্নাত হয়ে ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছে।এমনকি জানালার গরাদের ফাঁক গলে একফালি চাঁদের আলো রাইয়ের বিছানার উপরও এসে পড়েছে। অমনি রাই তানপুরাটা হাতে নিয়ে বিছানায় এসে বসলো ,অনেকদিন পর আজ ও ওর খুব প্রিয় একটি রবি ঠাকুরের গান ধরলো 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে, বসন্তের এই মাতাল সমীরণে....'গাইতে গাইতে যখন অন্তরাতে এসে ঠেকেছে ('আমারে যে জাগতে হবে, কী জানি সে আসবে কবে..')তখনই রাইয়ের কণ্ঠ বুজে এলো, গান থামিয়ে ও ফুঁফিয়ে কেঁদে উঠলো, না এ জীবনে আর শুভ ফিরে আসবে না, অন্তহীন অপেক্ষাতেই ওকে এ জীবনটি কাটিয়ে দিতে হবে। হয়তো বা শুভও দূর আকাশে তারাদের ভিড়ে ওর অপেক্ষায় বসে আছে! মনে মনে বিড়বিড় করল রাই ,'আমি আসবো শুভ, তোমার পাশে আমার জন্যও একটু জায়গা রেখো, আমিও তোমার পাশে তারা হয়ে জ্বলব দেখো একদিন'। রাইয়ের পক্ষে আজ আর গান করা সম্ভব নয় ভেবে ও আবার পায়ে পায়ে ছাদে চলে গেলো। ছাদের খোলা মেলা প্রকৃতি ও মিষ্টি বাতাস রাইয়ের সঙ্গী হলো এবার।

বিকেল থেকেই আরো একটি ভাবনা অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে রাইয়ের মনে। এমনটিতো আর কখনো হয়নি! প্রতিবছর ওর জন্মদিনে অভি ওকে কতবার করে ফোন করে! যেনো বুঝাতে চায়, ছেলের কাছে মায়ের জন্মদিনটি খুবই স্পেশাল একটি দিন। অবশ্য গতকাল রাতে কলেজ থেকে বাইরে যাবার কথা বলেছিল ও,তবে কি ওখান থেকে ফোনের টাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে না! ছেলের জন্য রাইয়ের কপালে গভীর চিন্তার ভাঁজ ফুটে উঠলো এবার। দু'তিনবার ফোন করে শুনলো নম্বরটি পরিসীমা সেবার বাইরে আছে। তবে কী এখনো হোস্টেলে ফিরে আসেনি! হয়তো তাই, ভেবে মনকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু কী করবে রাই এখন!আজ যে ওর ভাবনায় শুধু ছেলে আর ফেলে আসা অতীতের দিনগুলি,শুভকে ঘিরে সুখ দুঃখের জীবন্ত স্মৃতি!

ইদানিং রাইয়ের হয়েছে এই এক জ্বালা। গতানুগতিকতার বাইরে একটু বিশেষ দিন হলেই ওর মন স্মৃতির ঝাঁপি খুলে বসে। অতীতের ভাবনা গুলো কিছুতেই পিছু ছাড়ে না যেনো।মনে পড়ে শুভর চলে যাবার দিনটির কথা।ক'দিন থেকেই ওর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না,ডাক্তারের কাছে গিয়ে জানতে পারলো হার্টে তিনটি ব্লকেজ, অপারেশনের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেছিলো কিন্তু ভগবান সময় দেননি। তার আগেই সব শেষ হয়ে গেছিলো।বাবার শরীর ভালো নয় জেনে ছেলেও দু'দিন আগে বাড়ি এসেছিলো। হঠাৎ করে এভাবে মাথার উপর থেকে ছাতা চলে যাওয়াতে মা ছেলে দুজনেই ভেঙে পড়েছিলো একেবারে। আচমকা ওর ভাবনায় ছেদ পড়লো, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে না! কান পেতে শুনলো রাই,'তাইতো, মনে হচ্ছে যেনো কেউ দুতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে! কিন্তু রাতের বেলা তো কেউ আসে না রাইয়ের কাছে! তবে কী নীচে যাবে ও! ভাবতে ভাবতেই অভি একেবারে সটান ছাদে এসে, হ্যাপি বার্থডে মাই স্যুইট মম বলে মাকে জড়িয়ে ধরলো। বিস্মিত রাই আবেগে উত্তেজনায় কেঁপে ওঠে অস্ফুট স্বরে বললো,'বাবা তুই!'বলেই দুহাত দিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। অভি বললো,আমার এক্সাম এক মাস বাদে হবে আর তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো বলে গতকাল বাইরে যাবার কথা আমি মিথ্যে বলেছিলাম মা, এবার তুমি চাইলে মিথ্যে বলার জন্য আমার কানটি মলে দিতেই পারো,বলেই অভি মায়ের দিকে মুখটি বাড়িয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে মা ও ছেলে দুজনেই হেসে উঠলো...অনেকদিন পর আজ আবার ছেলেকে কাছে পেয়ে রাইয়ের মুখটি পূর্ণিমা চাঁদের মতোই খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে...অভি মায়ের হাত ধরে বললো'ঘরের দরজা বন্ধ পেয়ে বুঝে গেছি তুমি ছাদে বসে আকাশের তারা গুনছ। তাই সটান ছাদে চলে এলাম,'এবার ঘরে চলো মা,কেক কাটতে হবে না'!আমি কিন্তু উপহার সহ জন্মদিনের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়েই বাড়ি ফিরেছি।

<><><><>

With Best Compliments From :

আপনজন

- সুস্মিতা মজুমদার -

সারাদিন খাটা খাটুনির পর বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না শ্বেতার। মাথায় হাজারো চিন্তা। নিজেদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা ভেবে চোখে জল ভরে আসে। আজ আবার মায়ের সঙ্গে সৌরভকে নিয়ে একচেটে মনোমালিন্য হয়ে গেল। অভিভাবকদের কাছে সন্তানেরা চিরদিনই অপরিণত অবুঝ থেকেই যায়। বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাদের বিচার বিবেচনা ও বুদ্ধি পরিপক্ক হয়, সে কথা মানতেই চান না। সৌরভ সম্পর্কে মায়ের মনে যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব সেটা কোনভাবেই মেটাতে পারছে না শ্বেতা।

সহপাঠি হওয়ার সুবাদে সেই কৈশোর থেকে তাদের বন্ধুত্ব। সময়ের সাথে সেই বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়েছে। দুজনে একই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়েছে, শুধু দুজনের স্ট্রিম আলাদা ছিল। সৌরভ বর্তমানে চেন্নাইতে একটা কোম্পানিতে কর্মরত আর শ্বেতা ব্যাঙ্গালুরুতে।

চাকরির পাঁচ বৎসর পেরিয়ে যাওয়ার পর শ্বেতার মা মেয়ের বিয়ের তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছেন। সেই ব্যাপারে মেয়ের সাথে কথা বলতে গেলে শ্বেতা সৌরভের কথা বলে। শুনে শ্বেতার মা মহুয়া ওকে নানা উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। শুনে শ্বেতার মাথা গরম হয়ে যায়। রাগের মাথায় মাকে নানা কথা শুনিয়ে ফোন কেটে দেয়। তারপর থেকে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। শেষ পর্যন্ত বাবার ফোন পেয়ে মনটা শান্ত হয়েছিল। অবিনাশ বাবু জানালেন আগামী মার্চে মাকে নিয়ে ব্যাঙ্গালুরুতে আসছেন। সেই হিসাবে সৌরভের সাথেও পরিচয় করবেন এবং কথাবার্তা বলে নেবেন।

অবিনাশ বাবু ও মহুয়া এবার প্রোগ্রাম বানাতে বসলেন। শুধু ব্যাঙ্গালুরুতে নয়। তারা দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ানোর কথা ভাবলেন। সেইমত টিকিটের বন্দোবস্ত করা শুরু করে দিলেন।

করোনা কভিড-১৯ এর সংক্রমণ চীনের জন-জীবন ত্রাস্তমান করে তুলেছিল। সেই সংক্রমন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। ভারতে তখনও সংক্রমণ শুরু হয়নি। কিন্তু তার আতংক ভারতের প্রতিটি সংবাদপত্রের শিরোনাম দখল করে রেখেছে।

নিজেদের প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রথম সপ্তাহে অবিনাশ ও মহুয়া ব্যাঙ্গালুরুতে এসে পৌছলেন। শ্বেতা মহাখুশী। অনেকদিন পর বাবা মাকে কাছে পেয়ে সব মান অভিমান ভুলে গেল। অনেকদিন পর মায়ের হাতের রান্না খেয়ে যেন প্রাণ ফিরে এলো। সপ্তাহ খানেক পেরিয়ে যাওয়ার পর অবিনাশ মেয়েকে ডেকে বললেন, - 'পরের ইউকএ্যাণ্ডে সৌরভকে আসতে বল। ওর সাথে আলাপটা করে ফেলি। তারপর তো আমাদের আবার বেরিয়ে পড়তে হবে।

ইতিমধ্যে ভারতে করোনা সংক্রমন শুরু হয়ে গিয়েছিল। ২০/০৩/২০২০ তারিখ রাতে সৌরভ এসে পৌছাল। ২২ তারিখ থেকে ২৩ তারিখ রাতে ফিরে যাবে এই ছিল ওর প্রোগ্রাম। ২১ তারিখ দুপুরে খবর পাওয়া গেল ২২ তারিখ সারা দেশ জুড়ে গণ কার্ফু ঘোষণা করা হয়েছে। আর ২৩ তারিখ রাতেই দেশ জুড়ে লকডাউন ঘোষণা করা হয়। ২৪ তারিখ থেকে ২১ দিনের জন্য যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হলো। ২৩ তারিখ থেকে বিমান পরিসেবাও বন্ধ করে দেওয়া হলো।

সৌরভের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। এখন সে কি করবে ? বাঙ্গালুরুতে অন্যান্য বন্ধুরা আছে। কিন্তু তারা তো অনেক দূরে দূরে থাকে। তাছাড়া রাস্তার বেরুলে পুলিশের অত্যাচারও তো আছেই। সৌরভ শ্বেতাকে বলে 'আমি এখন কি করি' ? শ্বেতা জবাব দেওয়ার আগেই অবিনাশ বলেন 'আমাদের যেতে হবে তো ? নইলে খাবে কি ? ' শ্বেতা বলে 'তুমি একা যাবে না বাবা। বাজারে প্রচণ্ড ভিড় হবে। আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে। তুমিও চলো সৌরভ।

সৌরভ মরিয়া হয়ে বলে 'আঙ্কল, আমার যে এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। না হলে আর যেতে পারবো না।'

অবিনাশ বাবু বললেন - তোমার কোথায় যাওয়া হবে না। এখানেই থাকতে হবে, কারণ যাতায়াত ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এরকম অনিশ্চিত পথে তোমাকে যেতে দিতে পারি না।

সৌরভ ধপ্ করে সোফায় বসে পড়ে। অবিনাশ বাবু বললেন, - এখন বসলে চলবে না। বাজারে যেতে হবে, তাড়াতাড়ি চলো।

বাজারের অবস্থা দেখে কিছু জিনিষপত্র নিয়ে শ্বেতা বাবাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিল। তারপর সৌরভকে নিয়ে সমস্ত বাজার করে বিধবস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

বাড়ি ফিরে শ্বেতা সোজা বাথরুমে টুকে গেল। সৌরভ বাজার গোছাতে লেগে গেল। মহুয়াকে সামনে আসতে দিল না। সব ব্যালকনিতে মেলে রাখল, সব্জিগুলো ধুয়ে তুলে রাখলো। বাজারের এক অংশ ছিল মাস্ক, স্যানিটাইজার, হ্যাণ্ড ওয়াস, সাবান। তারপর স্নানে গিয়ে ঢুকলো।

পরদিন অর্থাৎ ২২ মার্চ ২০২০ এ জনতা কার্ফু ঘোষিত হয়। সন্ধ্যায় শঙ্খ ঘন্টা থালা বাজিয়ে হাত তালি দিয়ে সকলে দেশের ফ্রন্টলাইন যোদ্ধাদের উৎসাহিত করা হল।

অফিস আদালত, স্কুল কলেজ বাজার হাট সিনেমা হল, মল, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট যাতায়াত ব্যবস্থা সব বন্ধ। কিন্তু সৌরভ আর শ্বেতাকে অফিসে ওয়ার্ক ফ্রম হোম এর বন্দোবস্ত ছিল। তাই তারা বাড়িতে বসেই কাজ করতে শুরু করলো।

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই সৌরভ মহুয়ার সাথে কাজে হাত লাগালো। হাতে হাতে এটা সেটা কাজ করে দিতে লাগলো। ব্রেকফাস্ট বানাতেও সাহায্য করলো। ঘুম থেকে উঠে সব দেখে শুনে শ্বেতা অবাক।

বাড়িতে কাজের লোকের প্রবেশ নিষেধ। ফলে বাড়িতে অনেক কাজ। শ্বেতা আর সৌরভকে কাজে বসতে হবে। দুজনেই লেপটপ খুলে বসে পড়ে। সৌরভ কাজের ফাঁকে সুযোগ পেলেই উঠে পড়ে মহুয়াকে কাজে সাহায্য করতে লাগলো। তাই শ্বেতাও

বাধ্য হয়ে কাজে হাত লাগায়। দেখতে দেখতে পাঁচদিন কেটে গেল শনি রবিবার অফিসে ছুটী।

সবাই মিলে ঘরের কাজে হাত লাগালেন। খাওয়া খাওয়ার পর চারজনে মিলে তাস খেলা হলো। সন্ধ্যার পর অবিনাশের সাথে চললো দাবা খেলা। বাড়িতে খুশীর হাওয়া বয়ে চলে। সৌরভকে ইতিমধ্যে খুব পছন্দ করতে শুরু করেছেন মহুয়া। নিউজ শুনে করোনা ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচার জন্য যেখানে যা করার প্রয়োজন সবটা সকলকে মেনে চলতে বাধ্য করতো সৌরভ।

এক সপ্তাহের পর কিছু কিছু গ্রোসারি আর সব্জি পাওয়া যাচ্ছিলো। সে সব আনতে সৌরভ একাই বেরিয়ে পড়লো। ফিরে এসে সব জিনিষ ধুয়ে সেনিটাইজ করে স্নান করে তবে ক্ষান্ত হতো।

দেখতে দেখতে দশটা দিন পেরিয়ে গেছে। সৌরভকে নিয়ে অবিনাশ ও মহুয়ার মনে কোন দ্বন্দ্ব নেই। সৌরভও শ্বেতাদের সংসারে একেবারে সহজ হয়ে পড়েছে। বারে বারে খবর আসছিল লকডাউনের মেয়াদ আরও বাড়বে। সব কানা-খুচো সত্যি করে আবার লক্ ডাউন বাড়লো। এবার সৌরভের কিছুটা অস্বস্তি লাগছিল। বুঝতে পেরে শ্বেতা তাকে আশ্বস্ত করে। অবিনাশ ও মহুয়া সব বুঝতে পেরে ওকে বোঝালেন। ব্যাপারটায় তোমার কোন হাত নেই। সঙ্কট কালে মানিয়ে চলতে হবেই। আর তাছাড়া তুমি আসায় আমাদের কত সুবিধা হলো ভাবতো ? চিন্তা করো না। এখন তোমার ভাবনায় কোন কাজ হবে না। সরকার বাহাদুর যা বললেন, সেই মতেই কাজ হবে, তাই না ?

শেষ পর্যন্ত এপ্রিলের ২২ তারিখ থেকে ইন্টারস্টেট যাতায়াতের বন্দোবস্ত করলে সরকার। স্যোসাল ডিস্টেন্সিং ম্যানটেইন করে বাসের সিটে একজন বসে যেতে পারবে। সেইমত সরকার থেকে ফোন নং দিয়ে দেওয়া হব। সেই অনুযায়ী নিজের সমস্ত ডিটেল পাঠিয়ে দিলো সৌরভ পরদিনই ম্যাসেজ এসে পড়ে। বাস স্ট্যাণ্ডে যাওয়ার ব্যবস্থাও সরকার থেকে করে দিলো। অবিনাশ ও মহুয়াকে প্রণাম সেরে শ্বেতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিলো। কেউ কারো দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারছেন না। অবিনাশ বললেন, বারে বারে ফোন করো কিন্তু, আমরা খুব চিন্তায় থাকবো।

সৌরভের পৌছানো সংবাদ যথাসময়ে এলো। এখন থেকে দিনে কতবার যে শ্বেতাদের বাড়িতে সৌরভের নাম উচ্চারিত হয় তার হিসাব রাখার প্রয়োজন কেউ মনে করে না। কারণ এখন সৌরভ এবাড়ির একান্ত আপনজন।

<><><><><>

ভ্যালেন্টাইন ডে

- হিফজুর রহমান লস্কর -

ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে সুতপা অঞ্জনাকে বলল, ' চল একটু সামনে থেকে ফুল নিয়ে আসি ।' অঞ্জনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ফুল, কেন?'

সুতপা বললো 'বারে তুই দেখি অবাক হয়ে গেলি,আজ যে ভ্যালেন্টাইন ডে!'

'ও হ্যাঁ ।'

সুতপা বলেই চললো,'আজ আমি ফুল নেব, রজতকে দেবো----- ।' কত কথাই বলে চললো অঞ্জনা কিছুই শুনলো না। ওর মনে পড়ে গেল- -, আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এক ভ্যালেন্টাইন ডে এর কথা।

ও কল্পনায় বিভোর হয়ে ভাবছিল এমনি এক দিন বিজয় তাকে একটা ফুল দিয়ে প্রপোজ করেছিল। সেও ফুলটি গ্রহণ করেছিল এবং তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিজয়ের প্রেমে সে এতটাই বিভোর হয়েছিল যে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল।

একদিন পার্কে বসে বিজয় তাকে বলেছিল, 'জানো অঞ্জনা, তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে আমি কত স্বপ্ন দেখি। তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে আমি ঘর বাঁধছি কখনো গঙ্গার ধারে কখনও পাহাড়ের উপর ।'

অঞ্জনা এতটাই ওর প্রেমে বিভোর হয়েছিল যে ওর পড়াশোনায় ভাঁটা পড়ে। বি.এ ক্লাসে ফেল করে। আর ওখানেই বিপত্তি। রজত এম,বি,বি,এস এ সুযোগ পেয়ে তাকে ছেড়ে চলে যায়। আর কোন যোগাযোগ হয়নি। পরে সে শুনেছে বিজয় ডাক্তার হয়েছে,অন্য একটা মেয়েকে বিয়েও করেছে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে পথ চলছিল।

ইতিমধ্যে তারা একটি ফুলের দোকানে এসে গেল।

নীরবতা ভঙ্গ করে সুতপা বললো,' এই কি হলো?' অঞ্জনা কোন কথাই বলছে না।

চেয়ে দেখে অঞ্জনার চোখে জল। সুতপা ওর প্রেমে বিফল হওয়ার ঘটনাটা জানে । তাই ওর বুঝতে বাকী রইলো না।

দোকান থেকে সুতপা একটা ফুল নিল, অঞ্জনা নিল দুটো।

সুতপা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে,' তুই দেখি আজ বদলে গেলি, দুটি ফুল দিয়ে কি করবি?'

অঞ্জনা বললো, ' কেন, আজ যে ভ্যালেন্টাইন ডে!

সুতপা আরো অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, ' তা- তুই ফুল দিয়ে কি করবি?'

'একটা দেবো আমার মা কে আর একটা বাবাকে ।'

সুতপা আর কথা না বাড়িয়ে বলল, ' চল ।'

অঞ্জনাকে বিদায় দিয়ে সুতপা পথে যেতে যেতে ভাবতে থাকে,ওর কথাগুলো।

অঞ্জনার সে অতীত কাহিনী সুতপা সব জানে। ওর ভেঙ্গে যাওয়া জীবনের কথা গুলো বার বার তার মনে পড়তে লাগলো। তার মনটা অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। তার জীবনটাই যেন বদলে গেল অঞ্জনার কথায়। সেও স্থির করলো, না সে ফুলটি আর রজতকে দেবে না বরং মাকে'ই দিয়ে দেবে।

<><><><>

অভিশপ্ত রাত

- রফিক উদ্দিন লস্কর -

আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগের ঘটনা। সেই রাতের ঝড়বৃষ্টির কথা এখনও সাহেদের মনে আয়নার মতো। সেই অভিশপ্ত রাতটা সাহেদদের জীবনকে তছনছ করে দিয়েছে। সাহেদদের পরিবারে তিন ভাই, দুই বোন ও মা, এ নিয়ে তাদের সংসার। কয়েকদিন আগে তাদের বাবা মারা গেছেন এক রোড এক্সিডেন্টে। সেই শোক এখনও কাটেনি, সাহেদ পরিবারের বড়ো ছেলে। পড়াশোনার সাথে সাথে জীবন সংগ্রামেও ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে সাহেদকে অল্প বয়সে। শান্তির নীড়ে মায়ের মুখ একমাত্র সম্বল। মায়ের মুখ সেই অতীতের ফেলা ব্যথা বেদনাকে অনেক সময় হালকা করে নেয়। সংসারের টান পোড়েন এ তেমন কিছু নয়। কিন্তু বাবার মৃত্যুর চেয়েও সেই অভিশপ্ত ঝড়ের রাতটার যন্ত্রনা সাহেদদের পরিবারকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে। স্কুল, কলেজ বা রুটি রুজির তাগিদে সাহেদ যখন বের হয় তখন তার ঔৎসুক্য চোখ দু'টি কি যেনো চারপাশ দিয়ে খুঁজতে থাকে। তবে তার আত্মবিশ্বাস তাকেই জিয়েই রেখেছে।

দিন যায় বছর যায়, সাহেদের ভবঘুরে মন একচিলতেও ঘুমোতে যায় না। সারাদিন কর্মব্যস্ততা তার আড়ালেও আরেকটা মন সবসময় কি যেনো খুঁজতে থাকে। কে জানে তার সেই খোঁজার মতলব! কাউকে কিছু খুলেও বলেনি। জীবনের তেরোটা বছর পার হলো, সাহেদের সংসারের চিত্রও বদলাতে থাকে। উৎসব পার্বন আসলেও তার মন প্রায়ই আনন্দ বিমুখ থাকে। বন্ধু বান্ধবদের বিবাহ বা অন্যান্য নিমন্ত্রণ রক্ষা সাহেদ, মনের আড়ালে বসে থাকা একটা বিচ্ছেদ যন্ত্রণার অকাট্য অস্ফুটস্বর তাকে বেদম প্রহার করে। কে জানে তার ভাগ্যের চাকা আর দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে একদিন ঠোঁটে গোলাপের মতো হাসি ফোটে আনন্দ অশ্রুতে অবগাহন করবে সে।

সেদিন সাহেদের বন্ধু আরমানের বিয়ে, মহা ধুমধাম। শহরের এক নামি-দামি হোটেলে বিবাহের আয়োজন। সন্ধ্যা পরে বরযাত্রী, সেও সহযাত্রী হয়ে রওনা দিল। সন্ধে সাতটায় সবাই বিবাহভবনে গিয়ে পৌঁছল, হৈ-হুল্লোড় আর জনসমাগমও যেনো সাহেদের মনকে নাড়া দিতে পারেনি। একটা জীবন্ত পুতুলের মতো সাহেদ তার জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটাচ্ছে। খাওয়া দাওয়ার ঠিক নেই, জীবনের রুঠিন অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বিবাহ অনুষ্ঠানে এসেছে বলে আজ রাত আটটায় তার রাতের খাবার প্রায় সম্পন্ন। পাশের টেবিলে বসা কনেপক্ষের দু'জন ভদ্রলোক, ওরা গল্পচ্ছলে বলছেন যে আজ পরহেজগার পাগলীটাও আসেনি, না জানি কোথায় আছে! সাহেদের কানে একটু অস্পষ্টভাবে সেই কথাটা ভেসে আসলো। খাবারটা তাড়াতাড়ি শেষ করে একজন ভদ্রলোকের সাহেদ কানের কাছে গিয়ে ধীরে ধীরে শুধালো চাচা!...পাগলীজন কোথায় থাকেন? কত বৎসর থেকে?... ভদ্রলোক জানালেন সামনে একটা চৌরঙ্গী আছে তার ঠিক বাঁদিকের দোকানের বারান্দায় আজ প্রায় দেড় বছর থেকে আছেন।

সাহেদ চৌরঙ্গীর দিকে রওনা দিলো, বিদ্যুতের গতির মতো তার পা দুটি চলতে থাকে পাঁচ মিনিটের রাস্তা দু মিনিটে অতিক্রম করলো। সবশেষে সেই দোকানের বারান্দায় গিয়ে সাহেদ পৌঁছল, একটু এদিক ওদিক চেয়ে আস্তে আস্তে মহিলার কাছে গিয়ে বসলো। ঘুমটা পরা মুখ, পরণের শাড়িটাও তেমন ময়লাযুক্ত নয়। সাহেদের মনের জানালায় একটু শীতল বাতাসের যেনো ছোঁয়া লাগছে, মনের শক্তি প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। আলো-আঁধারি জীবনের পাতায় যেনো নতুন করে কোন কিছু জুড়তে যাচ্ছে সেই ভেবে সাহেদ পাগলীজনকে মা সম্বোধন করে বললো, মা! আপনার মুখটা দেখার খুব ইচ্ছে করছে, দেখাবেন? সাহেদের কণ্ঠস্বর পাগলীর নাড়িতে যেনো টান দিলো, কে তুমি বাবা!? বাড়ি কোথায়? আমি সাহেদ, বাড়ি মোহনপুর। সাহদের মুখ থেকে বাক্য শেষ হতে না হতে পাগলীজন তাকে জড়িয়ে ধরে অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন, সাহেদও কান্না আটকাতে পারেনি। তিনবছর থেকে জমানো কান্নার যবনিকা টেনে সাহেদ তার মা'কে নিয়ে বিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলো। বিয়ে বাড়ির আনন্দে আরেকটা আনন্দ সামিল করে রাত দশটায় নিজের বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলো।

<><><><><>

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানায় আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা ।

অল ইন্ডিয়া যুব যাদব মহাসভা

ভোলানাথ যাদব
সভাপতি
অসম যুব যাদব মহাসভা

কিশোর যাদব
সভাপতি
হাইলাকান্দি জেলা যুব যাদব মহাসভা

অন্তর্দ্বন্দ্ব

- তনিমা ভট্টাচার্য -

মিলিতার বাড়িতে প্রায়ই পার্টি থাকে। কখনো বা জন্মদিন কখনো বা বিবাহ বার্ষিকী আর কখনো বা কোনও নির্দিষ্ট কারণ থাকে না, যাওয়ার পর জানা যায় কত দিন ধরে সবার সাথে দেখা হয়নি জীবনটা বড় একঘেয়ে লাগছিল তাই সবাইকে ডাকলাম। ওদের ওই পার্টি মধ্যে মধ্যে অবশ্য আমাদের আনন্দ দে একঘেয়ে জীবনে যেন একটু প্রশান্তি। নীলের এসব ভালো লাগে, নীলের মতে এগুলো হলো দৈনন্দিন জীবনের আমোদ প্রমোদের সাধন। সে যাই হোক, আমার কিন্তু ওসব ততটা ভালো লাগে না ,অনেক লোকজনের মাঝে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলি। অন্যদের সামনে নিজেকে জমকালো ভাবে তুলে ধরার প্রবণতা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখি, আমাকে যেন জমজমাট পরিবেশ অস্বস্তিতে ফেলে দে, দমবন্ধ হয়ে আসে।

ওই দিন হঠাৎ প্রায় মাসখানেক পর - হ্যালো, রায়না আমি মিলিতা বলছি। এতদিন ধরে তোদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই, ব্যাপার কি বলতো?

- কিছু নারে। তুই বল কেমন আছিস তোরা? এ সময়ে ফোন করলি?

- তুই তো জানিস আমার ব্যাপার। হঠাৎ করেই আমার প্ল্যান হয়। কাল পিকনিকে যাবো ভাবছি, তোরা কত তাড়াতাড়ি আসতে পারবে বল

- তুই যে না, হঠাৎ করে আমি কিভাবে বলবো বল?

- নীলকে জিজ্ঞেস করে নে,আর কি?

- একথা নয় রে, আমরা আসার চেষ্টা করব।

মিলিতা নামটা মাত্র দু' বছর আগে পর্যন্ত অচেনা ছিল। সেবার আমরা পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ট্রেনে মিলিতাদের সাথে দেখা, একটা কম্পার্টমেন্টে ঠিক থাকার দরুন আমরা পাশাপাশি বসে ছিলাম। প্রথম দেখাতেই মিলিতার ব্যবহার আমাকে রীতিমতো অবাক করে দিল। মানুষকে আপন করে নেওয়ার এত সহজ সরলতার প্রকাশ মানুষের মধ্যে এখনো আছে আমাকে ভাবিয়ে দিল। ভালো লাগলো সময়টা কেমন করে চলে গেল বোঝাগেল না! বিট্টুর ও মিলিতার সাথে ভীষণ মিল হয়ে গেল। এদিন ট্রেনে বসে আমার মন যেন অন্য কোথাও পাড়ি দিচ্ছিল, যেন অন্তহীন সমুদ্রের একাকীত্ব থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টা মাত্র।

- কি ভাবছিলে বসে বসে।

- তুমি কখন এলে?

- আমি কখন এলাম তুমি বুঝতে পারোনি, কি চিন্তা করছিলে? বিট্টুর কথা ভাবছিলে??

- বিট্টু! হ্যাঁ বিট্টুর কথা ভাবছিলাম, একবার বিট্টু কে দেখে এলে হয় না, অনেকদিন হয়ে গেছে তাছাড়া এত ছোট ছেলেকে বোডিং পাঠিয়ে কি যে ভালো হবে বুঝতে পারিনা।

- এই আবার শুরু হলো, এ নিয়ে আর কত কথা বলবে, সব কথা হয়ে গেছে। এখন বাদ দাও

- আমি বিট্টুর কথা বললেই তুমি বাদ দিতে বল, তুমি যে কি হয়ে গেছো আমি বুঝে উঠতে পারি না, তুমি কত বদলে গেছো আমান সব কথাতেই আপত্তি। একেক সময় মনে হয় তুমি কি সত্যিই আমাদের ভালোবাসো ...??

- তোমার আবার কান্নাকাটি শুরু হলো... আচ্ছা বিট্টুকে দেখতে যাব এখন খাবারটা দাও।

- মিলিতা ফোন করেছিল, কালকে ওদের পিকনিকে যাওয়ার প্ল্যান। আমাদের বলল যেতে, তাছাড়া কাল তো রোববার... তাই আমি.....

- ঠিক আছে যাব আমরাও প্ল্যান করে নেই।

- আমি বলে দিয়েছি, জানি তুমি না করবে না। শীতের সকাল চারদিকে হিমের হাওয়া বইছে! তার মধ্যে একটা মধুর আভাস যেন চারিদিকের পরিবেশকে মাতিয়ে দিয়েছে স্বচ্ছ ঘাসের উপর শিশিরের বিন্দু প্রকৃতিকে এতো সুন্দরকরে তুলেছে যেন সারা বছরের জন্যই প্রতীক্ষা করে থাকে। ধীরে ধীরে কুয়াশার ঘোর কাটিয়ে গরমের ভাব জাগার সঙ্গে সঙ্গে তা যেন অবসান হয়।

- এতো চুপ করে আছিস রে? কি ব্যাপার বল তো

- কিচ্ছু না রে, বিট্টুর কথা মনে পড়ছিল। ছেলেটাকে অনেকদিন ধরে দেখিনি! চল তোর মনটা ভালো করে দিই। নতুন লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। এ হলো হচ্ছে অর্ণব, আমার ননদের হবু বর। রীতির কথা মনে আছে? সেবার এসেছিল।

- অর্নব!

নামটা যেন কোথাও হারিয়েছিল এত বছর পর আবার এসে ধরা দিল। কেন যেন সব আগের মত লাগছিল, চেহারায় অনেকটা মিল। আমারও যেন সবকিছু ভালো লাগছে হঠাৎ করে পুরনোতে বাঁচতে ইচ্ছে করছিল..

- এ কি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছো কেন? গাটাতে গরম লাগছে, শরীর ভালো নেই। চলো ঘরে চলে যাই?

নীলের কথায় হঠাৎ ঘোর কাটলো। কেমন যেন নিজেকে মেলাতে পারছিলাম না, আমি কোথায় আছি.... আট বছর আগে না আরো কোথাও...নিজেকে কেমন যেন অনুতপ্ত লাগছে ...না জানি আমি কিছু করিনি তাও কেন এমন বোধ ? যা চলে গেছে তা নিয়ে অনুশোচনা কেন ? আমার একটা ব্যক্তি সত্তা আছে। নিজের সহধর্মিনী ছাড়া আমার নিজস্ব একটা পরিচয় আছে আমি নারী। নারী মনের নানান দৃষ্টিভঙ্গি অস্বীকার করা যায় না। মানুষের মন অসীম এক বিশাল সমুদ্রের ন্যায়, তার কোন স্থিরতা নেই। মস্তিষ্ক এক জিনিস চায় মন আরেক জিনিস চায় দুটির প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক সময় মন ভুল-শুদ্ধের, গণ্ডি পেরিয়ে চলে যায়। যেখানে ফেরা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু এর মধ্যে পরিপূর্ণতা আছে তৃপ্তি আছে নিজেকে নিয়ে নিজস্ব বাঁচার সন্তুষ্টি যাতে নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী বলে মনে হয়। আমিও তো তাই নিজের অজান্তেই ক্ষীণ মুহূর্ত উপভোগ করতে চেয়েছিলাম যেটা না জানি কবে আমার অবিবেচক মনে ঘর করেছিল। নীলের নিরব ভালবাসার মাঝে তা যেন জয়ী হয়ে গেল।

কি তুমি ঘুমাওনি এখন তো চারটা বাজে, এমন দেখাচ্ছে কেন? বাথরুমে গিয়ে মুখটা জল দিয়ে ধুয়ে এসো, ভালো লাগবে!

আমিও পলক দৃষ্টিতে নীলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। মনে হচ্ছে শুধু সে সব জানে, জেনে শুনে না জানার ভান করছে, আমি কি বলবো ওকে, কি বলবো? সত্যিই কি সে আমার কথা বুঝবে? নাকি ভুল বুঝবে? তোমাকে আমার কিছু বলার ছিল। সারাদিন আমি একটুকু সময় দেইনি তোমাকে।

এত রাত্রে এ কথা বলতে বসে আছো? সত্যি তোমাকে নিয়ে পারি না এখন ঘুমোও।

না, একথা নয় আসল কথা বলা হয়নি, আরও কিছু কথা আছে?

কাল সকালে বললেই তো হবে। জানো অর্ণবকে অনেক পরিচিত লাগছিল.....

হ্যাঁ, ছেলেটাই এমন আমারও খুব ভালো লেগেছে... হঠাৎ নীল মুচকি হেসে বলে উঠলো -আচ্ছা একটা কথা সত্যি করে বলতো অর্ণব কি আমার চেয়ে বেশি হ্যান্ডসাম, বেশি আকর্ষণীয় যে এত চিন্তা বাড়িয়ে দিচ্ছে....

কি বলতে চাইছো তুমি... এ অর্ণবের সাথে আমার নতুন পরিচয়।

তোমার কি মনে হয় আমি এ কথা ভাবতে পারি তোমাকে কি আমি আজ থেকে জানি, তোমাকে কতটুকু বুঝি তা নিয়ে কি এখনো তোমার সন্দেহ আছে, তোমাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়েই তো আমার জীবনটা পরিপূর্ণতা পেয়েছে তাও কি ভাষা দিয়ে বুঝাতে হবে.....

এক দৃষ্টিতে নীলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, বুঝলাম নীলকে পেয়ে আমি এতটুকু ঠকিনি।

ফোনটা বেজে চলছে - রিসিভারটা উঠিয়ে হ্যালো, রায়না হ্যালো ,কথা বলছিস না কেন তুই? রায়নাই তো! হ্যাঁ, আমি নীলের রায়না বলছি ।

<><><><><>

দেশপ্রেম

- করবী খাসনবিশ -

বুবলার দাদু স্বাধীনতা সংগ্রামী তবে বর্তমানে রাজনীতির থেকে শতহস্ত দূরে। বর্তমান রাজনীতির হর্তাকর্তারাও অবনীভূষণকে পছন্দ করে না। কারণ অবনীভূষণ সেই অগ্নি যুগের মানুষ।

কিন্তু নাতির আবদার আজ ছাব্বিশে জানুয়ারীতে পতাকা উত্তোলন দেখবে। দাদু আর নাতি এগিয়ে চলে।

এইসব দিনে যেমন গান্ধীজীর জন্মদিন, স্বাধীনতা দিবস, তেইশে জানুয়ারীতে খড়খালি গ্রামের বাচ্ছা বুড়ো সকলেরই আনন্দ হয়। গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধান নিজে আসে।গ্রামের পীরতলার মাঠে উঁচু খাম্বার মাথায় পতাকা তোলা হয়, নেতারা ভাষন দেন।

গ্রামের স্কুলের মাস্টার মশাইরা সব ছাত্রদের নিয়ে গান করেন। তারপরে কচুরী জিলীপি খাওয়া হয়। পঞ্চায়েত অফিসের কেষ্টবিষ্টুরা দুপুরে জমিয়ে মুরগীর ঝোল ভাত খায়।

তারপরে অবশ্য আর তাঁদের দেখা পাওয়া যায় না।

খড়খালি গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই দরিদ্র শ্রেণীর।

আজ ছাব্বিশে জানুয়ারী গ্রামে সকাল থেকে তীব্রস্বরে লাউডস্পীকারে দেশাত্মবোধক গান বাজছে। বড়ো বড়ো গাছের উঁচু ডালে দড়ি বেঁধে ছোট ছোট কাগজের পতাকা ঝুলছে।

সব নেতারা মঞ্চে ভাষন দিচ্ছেন। এক একজন উঠছেন মঞ্চে আর কে কতবড়ো দেশপ্রেমিক তার বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। এই দেশের জন্য এই করেছেন, ঐ করেছেন। আর সবাই শুনছেন।

বুবলা দাদুকে বলে"দাদু এরা সবাই দেশ প্রেমিক?"

কোনো উত্তর নেই দাদুর মুখে, দাদু শুধু হাসেন,আর নাতির হাত ধরে এগিয়ে চলেন।

একমাত্র ভবেন মাস্টার একাই বক বক করে চলেছে, সবাই বলে পাগলা মাস্টার। সংসার করেনি, একসময় ছাত্র পড়াত কিন্তু স্কুলের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারীকে তোয়াজ করে চলতে পারেনি। তার ওপরে ছাত্রদের শুধু পরীক্ষার জন্য পড়ায়নি, পড়াত কিছু শেখার জন্য, তাই অসময়ে অবসর নিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।

ছাব্বিশে জানুয়ারী দুপুর গড়িয়ে গেছে, দেশপ্রেমীকরা তখন পীরতলার মাঠে।

আজ গ্রামের অনেকেই পাতপেড়ে খাচ্ছে আর নেতাদের সুখ্যাতিতে ভেসে যাচ্ছে।

এদিকে হঠাৎ হাওয়ায় চারিদিকে খাওয়া এঁঠো কলাপাতা মুরগীর হাড় আর ছেঁড়া পতাকা একসাথে উড়ছে।

ভবেন মাস্টার আর আধ ন্যাংটো দুটো বাচ্চা ছেঁড়া পতাকাগুলো কুড়িয়ে চলেছে। কেউ যেন পা না দিয়ে ফেলে তাই।

দাদু এবার নাতিকে বলে "ঐ দেখ বুবলা, তুমি দেশপ্রেমিক দেখতে চেয়েছিলে ঐ ওরা দেশপ্রেমিক। জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষা করা সব থেকে বড়ো দেশপ্রেম।

<><><><><>

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

শারদীয় দুর্গোৎসব সবার জীবনে সুখ, শান্তি নিয়ে আসুক এই শুভ কামনায় -

রম্নলিয়া আজম চৌধুরী (ডেইজি)

সভাপতি, ৩১ নং তারাচান্দ এল.পি. স্কুল পরিচালনা সমিতি, চন্দ্রপুর ২য়, লালা

মানবী

- সোমা মজুমদার -

এই যে হিম ঝরিয়ে বয়ে চলা নিশুতি রাতের হাওয়ার স্রোত তার কাছে মনের কোন কথাই গোপন করা যায় না। হাওয়ারা সব জানে, অব্যক্ত কষ্ট না বলা গল্প গোপন কান্নার কারণ, সব এরা ঠিক জানে। আর জানে জেগে থাকা তারার দল। চাঁদ না ওঠা আকাশের ওদিক এদিক ছড়িয়ে থাকা ঝাঁক ঝাঁক তারারা সব দেখছে, নিশাচর মানুষগুলোর জেগে থাকার কারণও এদের অজানা নয়।

রোজকার মতোই জেগে জেগে রাতের আকাশ আর শান্ত বাতাসের সাথে মৌন আলাপ জমিয়ে দিয়েছে মেঘলা...। রাত প্রায় সাড়ে বারোটা বেজে গেছে, মা প্রেসারের ঔষধটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, পাশের ঘর থেকে রাতের নিরবতা ভেঙে ভেসে আসছে ছোট বোন পুতুলের পড়া মুখস্থ করার শব্দ। পুতুলের স্বপ্ন সে ডাক্তার হবে। পড়াশোনায় অতটা মেধাবী না হলেও ভীষণ মনযোগী সে। অসুস্থ মা, ছোট দুই বোনকে নিয়ে মেঘলাদের সংসার। বাবা স্কুল মাস্টার ছিলেন। পরিবারের উপার্জন বলতে বাবার পেনশনের টাকাটা, কিছুদিন হলো মেঘলা আরো একটা স্কুলে জয়েন করছে, বাড়িতেও টিউশন করায়। আগের একটা স্কুলও ছিলো। এবার আর একটা। যাক্, মায়ের হার্টের অসুখের সেই দামী ঔষধ গুলো এখন আর মাসের শেষ দিকে পাঁচ দিন না খেয়ে বড় কষ্ট করে দমের উপর দম ফেলে থাকতে হবে না। পুতুল আর জারা'রও ছোট ছোট কিছু বায়না হয়তো পূরণ করা যাবে। এই ভেবে আজ মেঘলার মন একটু হলেও হালকা। কাল স্কুল থেকে আসার সময় রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা অসহায় বৃদ্ধাটির জন্য কিছু করতেও বড্ড মন চায় মেঘলার। কিন্তু কি করবে সে, সেই উপায় কি আছে তার কাছে? সত্যি এদের জন্য ভাবে অনেকে কিন্তু করার খুব কম সংখ্যক মানুষ। এই সব ভাবতে ভাবতে মেঘলার মেঘাচ্ছন্ন মনের কোণে একটু আগের সেই ভাললাগার রেশমেখে যে রোদের কণাগুলো উঁকি দিচ্ছিলো তারা যে নিমিষেই আবার উধাও হয়ে গেলো।

আচ্ছা, পৃথিবী নামের এই একটা গ্রহে এমন সব ধনী গরীব আপন পর জাতপাত হিংসা-বিদ্বেষের দ্বন্দ্বগুলো কেন লাগিয়ে দিলেন বিধি ? হাওয়ার স্রোতে অজানা কার যেন উদ্দেশ্য প্রশ্নটি ছুঁড়ে দেয় মেঘলা।

মেঘলারা তিন বোন, তাদের কোন ভাই নেই। মনে আছে মেঘলা তখন সে অনেকটাই ছোট। পাশের ঘরের এক চাঁচি মা'র সাথে ঝগড়া করে মা'কে বলতো 'আঁটকুড়ী', ছোট্ট মেঘলা মা'কে বলতো - মা 'আঁটকুড়ী' কী ? মা বলতেন "যাঁর সন্তান নেই তাকে আঁটকুড়ী বলে।" মেঘলা বলতো "তোমার তো সন্তান আছি আমরা, তবে তোমাকে কেন আঁটকুড়ী বলে ?" মা বলতেন "তোমাদের কোন ভাই নেই রে মা, এই সমাজে ছেলে না থাকলেও 'আঁটকুড়ী বলে, শুনিসনি চাঁচি আরো একটি কথা বলে "আঁটকুড়ী আপুত্র।" আচ্ছা মা, ছেলে হলে কী করে, যেটা মেয়ে করতে পারে না ? কিশোরী মেঘলা প্রশ্ন করে মা'কে। দীর্ঘশ্বাস মিশিয়ে মায়ের উত্তর, ছেলে বড় হলে অনেক টাকা রোজগার করবে, শেষ বয়সে বাবা মা'কে দেখবে। ছেলে বিয়ে করে বংশবাতি বাড়াবে, বাবা মা মরলে কবর যিয়ারত করবে / মুখাগ্নি করবে। আচ্ছা মা মেয়ে কি ওসব করতে পারে না ? না রে! মেয়ে তো পরের বাড়ির জন্য জন্মায়। বড় হলে বিয়ে দিয়ে দিতে হয়, সে এসব কি করে পারবে। আচ্ছা মা, মেয়েরা কি বিয়ে ছাড়া আর কিচ্ছু করতে পারে না ? এদের কি আর কিছুই করার নেই ? আরে পাগলি, কি যে বলে! বিয়ে ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না কেন ? এই তো রান্নাবান্না বাচ্চা জন্ম দেওয়া, এদের মানুষ করা, স্বামী শ্বশুর বাড়ির লোকদের সেবা যত্ন করা এও কি কম। আচ্ছা মা, আমি যদি তোমার ছেলে হয়ে যাই! তুই তো মেয়ে হয়ে জন্মেছিস রে, ছেলে হবে কি করে। মা আমি যদি বড় হয়ে তোমাদের অনেক টাকা রোজগার করে এনে দিই ? শেষ বয়সে তোমাদের দেখি, আব্বার কবর যিয়ারত করি / বাবার মুখাগ্নি। মা হাসেন....

শুন মা, এসব ভাবিস না। এসব ভাবাও পাপ রে। মেয়ে হয়ে জন্ম নিয়েছিস, মাথা নিচু করে স্কুলে যাবি। কেউ কিছু জিগ্যেস করলে আস্তে করে উত্তর দিবি, নয়তো। মা আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পেলে আঁচল দিয়ে ভেজা চোখের পাতা দুটো একবার মুছে নেন। 'নয়তো' কি মা ? বলো না মা, ওমা বলো না। নয়তো দুদিন পর বিয়ের আলাপ এলে পাড়াপড়শি ছেলের বাড়ি গিয়ে বদনাম গাইবে। এই মেয়ে বড় করে কথা বলে, যারতার সাথে কথা বলে, একটু হাসির কিছু হলেই ওমনি হেসে দেয়, কাঁদেও, সকালে বেরোয় আর বিকেলে বাড়ি ফিরে। খিদে পেলেই দেখো খেয়ে নিচ্ছে আরো কত কিছু... ওমা একি !! হাসির কথা হলে মেয়ে কি হাসবে না, কষ্ট পেলে কাঁদবে না ? খিদে পেলে খাবে না, সে কি গো মা! ? না রে মা, না। মেয়েদের বেশি হাসতে নেই, কাঁদতে নেই। খিদে পেলেই খেতে নেই। শুনিসনি, ঐ বাড়ির মুন্নীর দাদী কথায় কথায় মুন্নী'র মা'কে বলেন, আমার ছেলেরা খেয়ে যাওয়ার পরে দুপুরে ওদের খাওয়ার বাটিতে করে আলাদা রেখে দিয়ে তারপর খাও। আচ্ছা উনার ছেলেরা খাওয়ার আগে খিদে পেলে মুন্নীর মা কি তাহলে খাবেন না? না, খাবেন না। মেয়েদের খেতে নেই। আমি বিয়ে করবো না মা, আমি তোমাদের দেখবো। শেষ বয়সেও তোমাদের আমি দেখবো। আমি এমন মেয়ে হবো না, আমার

মেয়ে হতে ভালো লাগে না মা। আমি ছেলে হবো মা, আমি তোমার ছেলে হবো। মেয়েকে বুকের উষ্ণতায় জড়িয়ে নিয়ে চোখ মুছেন মেঘলার মা।

আজও মাঝে মাঝে সেই কথাগুলো বড্ড মনে পড়ে মেঘলার। আজ আর ছেলে নয়, মেয়ে হয়েই থাকতে ভালো লাগে তাঁর। একটা মেয়ে যে আব্বার কবর যিয়ারত করতে পারে, পারে বাবার মুখাগ্নি করতে। একটা মেয়ে, যে মেয়ে দিনশেষে দু'হাত ভরে উপার্জন করে বাবা মা'র মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে, যে মেয়ে বাবা মায়ের শেষ দিনের ভরসা হয়ে পাশে দাঁড়ায় শক্ত হাতে...। যে মেয়েটা হাসির কথায় হাসতে পারে, দুঃখ পেলে কাঁদতে পারে, লোকে কি ভাববে তা না ভেবে।

সেদিন ছোট বোন জারা স্কুল থেকে এসে একটা নুতন স্কুল ব্যাগ চেয়েছিলো দিদির কাছে। দেবো কিনে বলে এখনও একটা নতুন স্কুল ব্যাগ দিতে না পারলেও এখন মেঘলার কেন জানি কষ্ট হচ্ছে না। আজ না হয় দুদিন বাদে সে ঠিক কিনে দেবে। ভালো লাগছে এটা ভেবে এদের আবদার শোনার সে তো পাশে থাকতে পারছে, শেষ দিন অবধি বাবাকে পেয়েছে, মায়ের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে না পারলেও পাশে তো আছে শেষ দিনের ভরসা হয়ে।

রাত অনেকটা হয়ে গেলো। হঠাৎ মোবাইলটা খুলে দেখতেই চোখে পড়ে ন'টা মিসড্ কল। রাসেল এতগুলো ফোন করলো অথচ বুঝতেই পারলো না সে। এবার নিশ্চয় খুব বকবে। শুধু বকবে না কৈফিয়ৎ ও চাইবে, কেন ফোন ধরলো না। কোথায় ছিলো? তাহলে কি তাঁর সাথে কথা বলতে ভালো লাগছে না আর! আরো কত কিছু। রীতিমতো ভয়ে ভয়ে নম্বরটা ডায়েল করেও আবার কেটে দেয় মেঘলা। প্রায় সাথে সাথে আবার মোবাইলের স্ক্রীনে হলুদ আলোটা জ্বলে উঠলো। রাসেল আবার ফোন করেছে... আজ যদি আবার সেই প্রশ্নটা করে সে, চাপ দিতে থাকে! তবে কি করবে। কি উত্তর দেবে। কিছুই ভেবে পায় না মেঘলা...! দু'একটা রাত পাখি কি যেন এক আশ্চর্য রকম শব্দ করে ডেকে চলছে...। রাতের নিরবতা খণ্ডন করে মাঝে মাঝে দু'একটা পাতা ঝরার শব্দ হচ্ছে টুকটাক। শেষ রাতের স্নিগ্ধ জোছনা যেন ভিজিয়ে দিচ্ছে মহাকালের গল্প...। উপত্যকা বেয়ে নেমে আসছে এক অপার্থিব প্রশান্তি। এখন নিজেকে বড় ভালো লাগছে মেঘলার। নিজের উপর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হচ্ছে তার...। কিচ্ছু যায় আসে না, দুনিয়া তাঁকে কি বললো তাকে নিয়ে কি ভাবলো, ভাবলো না, এখন তাতে তার কিছু যায় আসে না। সে নিজেকে যেটা মনে করে, সে আসলে সেটাই। এই আত্মবিশ্বাসটা সে পেয়ে গেছে। গলাটা একবার ঝেড়ে নিয়ে রিসিভ করলো ফোনটা। কি হয়েছে তোমার মেঘলা? ব্যাপারটা কি বলতো! এখন কোন রাজকার্যটা সারছিলে যে এই গভীর রাতেও ফেসবুকে অনলাইন দেখছি অথচ ফোনটা ধরছো না যে! একটানা অনেকগুলো প্রশ্নকরে একটু থেমে আবার মেঘলার কোন উত্তরের তোয়াক্কা না করে বলতে শুরু করলো - দেখো মা অসুস্থ, আমাদের ঘর চলছে না, তুমি যদি এমন কোন আপত্তি দেখাও তবে আমার পক্ষে তোমাকে সময় দেওয়া আর সম্ভব নয়, স্যরি! এতদিন যে কথাটি বলতে গিয়েও সাহস হয়নি। আজ যেন এক আশ্চর্য রকম শক্তির সাহস পেয়ে সেই কথাটি বলে দেয় মেঘলা।

- দেখো, এখানে আমার মাও অসুস্থ তাছাড়া আমার ছোট দুটো বোন আছে। আমার এখানে এদের পাশে থাকাটা খুব দরকার।
- তার মানে তুমি এখন বিয়ে করবে না।
- না।
- না মানে কি?
- না মানে না। বিয়ে ছাড়াও আমার আরো অনেক কাজ আছে।

আধোঘুম জড়ানো কণ্ঠে মা ডাকেন, মেঘলা রে আমার জলের বোতলটা একটু এগিয়ে দে মা... মেঘলা মোবাইলে ফ্লাসলাইট জ্বালিয়ে মায়ের ঘরের দিকে চলে যায়...।

<><><><>

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।
শারদীয় দুর্গোৎসব সবার জীবনে সুখ, শান্তি নিয়ে আসুক এই শুভ কামনায় -
হিন্দুস্থান ক্লথ স্টোর্স
নতুন রূপে
নতুন সাজে

যে কোন সরকারি, বেসরকারি স্কুলের ইউনিফর্ম, স্কুল ড্রেস, টাই, বেল্ট এর সেরা ঠিকানা।
মঙ্গলবারি বাজার, লালা
প্রোঃ জমিল আহমেদ চৌধুরী
লালা, ৭৮৮১৬৩, হাইলাকান্দি
ফোন ঃ- ৭০০২৫৩০৫১৮
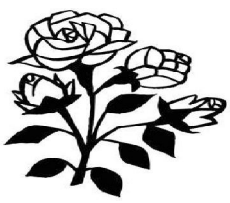

শিল্পী

- লুবনা আখতার বানু -

শিল্পীর ছোট্ট গৃহে মাত্র ছয়জন লোকের বসবাস। ঠাকুমা,মা,বাবা ও ছোট ছোট আরো দুটি বোন। ঠাকুরদা জীবিত আছেন বলেই অনেকের ধারনা। তিনি শিল্পীর বাবা অর্থাৎ সৌমেনবাবুর জন্মের পরই রোজগারের উদ্দেশ্যে বিদেশে গিয়েছিলেন। আর তারপর চলে গেছে দীর্ঘ পঁচিশটি বছর। এই পঁচিশ বছরে সৌমেনবাবুর বাবা একটি বারের জন্যও স্ত্রী ও পুত্রের কোন খবর নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। সৌমেনবাবুর মায়ের ধারনা তিনি বিদেশে আবার সংসার পেতেছেন।

সরলাদেবী অর্থাৎ সৌমেনবাবুর মা অনেক কষ্টে লোকের গৃহে কাজ করে তার সংসার কোন রকমে চালাতে থাকেন। অতিকষ্টে এভাবেই কাটতে থাকে সরলাদেবীর দিনগুলি। ছেলেকে একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করালেও তাকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব হয়ে ওঠেনি তার পক্ষে। ছেলে একটু বড়ো হতেই একটি হোটেলে রান্নার কাজ করতে শুরু করলেন। আর বছর তিন যেতে না যেতেই মা ও ছেলে মিলে একটি ছোট্ট চায়ের দোকান করলেন। চা ছাড়াও সেখানে পাওয়া যেত পান, বিস্কুট, চাল, ডাল ইত্যাদি টুকিটাকি। এতোদিনে সরলাদেবীর দুঃখ কিছুটা হলেও লাঘব হল। এখন তাকে আর লোকের গৃহে কাজ করতে যেতে হয় না। সারাদিন নিজের দোকানে বসেই তার দিন কেটে যায়।

আরো মাস কয়েক যেতেই তিনি তার ছেলের বিবাহ দিলেন। পুত্র-বধূও পেলেন ঠিক তার মনের মতোই।সুখেই কাটছিলো তাদের দিনগুলি। বছর কাটতে না কাটতেই সরলাদেবী পেলেন নাতনী শিল্পীকে।গোটা গৃহে যেন এলো এক আনন্দলহরী।এভাবে অভাব অনটনের মধ্যেও তাদের দিনগুলি যেনো স্বপ্নের মতোই কাটছিলো। সকলের ভীষণ আদরের শিল্পীও ধীরে ধীরে বড়ো হতে লাগলো।শিল্পীর বয়স চার হতেই তাকে শিক্ষা অর্জনের জন্য গৃহের নিকটেই একটি বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেওয়া হলো।

আর্থিক স্বচ্ছলতা বর্তমানে বদলে দিয়েছে সৌমেনবাবুকে। তিনি নিজেকে পালটে ফেলতে এতটুকু সময় নষ্ট করেন নি। বর্তমানে রোজরাতে নেশা করে গৃহে ফেরা তার অভ্যাসে দাড়িয়েছে। সরলাদেবীর সুখের সংসার এভাবেই অন্ধকারে ছেয়ে যেতে লাগলো দিনের পর দিন আরো একবার। বহু কষ্টে দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করে সরলাদেবী তিলে তিলে যে সুন্দর ফুলের বাগান সাজিয়েছিলেন, তা যেন নিমেষেই নষ্ট হতে থাকে।স্ত্রী লক্ষ্মী সেই কুপথ থেকে স্বামীকে ফেরাতে চেষ্টা করলে তার কপালে জুটতো বেত্রাঘাত ও লাথি। এভাবে দিন কাটানো ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠলো তাদের পক্ষে। এভাবে অতি যন্ত্রনার মধ্যেই লক্ষ্মী প্রসব করলেন আরো দুটি কন্যা সন্তান।

দিন কাটতে লাগলো আর সংসারের খরচও বাড়তে লাগলো। সৌমেনবাবু যা রোজগার করেন,তার সবটাই কুপথে ব্যবহৃত হয়। দোকান থেকে যতটা রোজগার হয় তাতে সংসার চালানো অসম্ভব হয়ে পড়লো সরলাদেবীর পক্ষে। শিল্পীর শিক্ষার জন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। বোন পূজা ও আরতিও ক্রমশই বড়ো হয়ে উঠতে লাগলো। সরলাদেবী হতাশ হয়ে পড়লেন। তবে কি আদরের শিল্পীকেও শিক্ষিত করে তোলা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে না! এই সমস্ত চিন্তা ভাবনাই দিনের পর দিন বয়সের সাথে সাথে সরলাদেবীকে শয্যাশায়ী করে তোলে। ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। লক্ষ্মীদেবীও বড়োই অসহায় হয়ে পড়েন। এরই মধ্যে নেশা ধীরে ধীরে সৌমেনবাবুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। অত্যাধিক পরিমান নেশার কারনে কিছুদিনের মধ্যেই সৌমেনবাবুর মৃত্যু ঘটে।

সৌমেনবাবুর মৃত্যু,ঠাকুমার অসুস্থতা ও মায়ের অসহায়তা মাত্র দশম শ্রেনীর শিল্পীকে সংসারে যেন অনেক দায়িত্বশীল করে তোলে। ইচ্ছে না থাকলেও ছাড়তে হয় তাকে তার বিদ্যালয় জীবন।আর অংশ নিতে হয় সংসারে একজন পুরুষের ভূমিকায়। দোকান ও টিউশন করে তাকে এই কম বয়সেই ধরতে হয় সংসারের হাল। শিল্পী প্রতিজ্ঞা করে যেভাবেই হোক না কেন,তার ঠাকুমার অতি কষ্টে গড়ে তোলা সংসারে সে আবারো শান্তি ও স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনবে। যেভাবেই হোক না কেন তার ছোট্ট বোন দুটোকে সে মানুষের মতো মানুষ করে তুলবে। সে আরো প্রতিজ্ঞা করে যে সে তার অসহায় মায়ের পাশে শক্তি হয়ে দাঁড়াবেই।

এভাবেই শুরু হয় শিল্পীর জীবনের এক নতুন অধ্যায়। দিনের পর দিন কঠোর পরিশ্রম করেই চলতে থাকে শিল্পীর জীবন। গোটা পরিবারকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে কোন কোন দিন নাওয়া-খাওয়ার সময় পর্যন্ত থাকে না শিল্পীর। যথাসময়ে দোকানে বসা,টিউশন করা ও বোনেদের বিদ্যালয়ে দিয়ে আসা ও নিয়ে আসাতেই কেটে যায় তার সবটা সময়। ছোট্ট বোন দুটোর মিষ্টি হাসি রাতে শিল্পীকে ভুলিয়ে দিতো তার সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমকে। আর তাকে পুনরায় প্রস্তুত করে তুলতো আগামী দিনের জীবন যুদ্ধের জন্য। এভাবেই চলতে থাকে বছরের পর বছর সময়। নিত্যদিনের অভ্যাসে সময়ও দ্রুত গতিতে প্রবাহিত হতে থাকে একই নিয়মে।এভাবে কেটে যায় আরো ত্রিশটি বছর।

আজ আরো ত্রিশ বছর পর শিল্পীর ছোট্ট গৃহে মাত্র দুজন লোকের বসবাস। শুধুমাত্র শিল্পী ও তার মা আজ এই গৃহে থাকেন। এরই মধ্যে সরলাদেবীও আজ আর আমাদের মধ্যে বেঁচে নেই। শিল্পীর ছোট্ট মিষ্টি বোন দুটিও আজ অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে। শিল্পী তাদের নিজের মনের মতো করে গড়ে তুলতে পেরেছে। তারা আজ খুব ভালো মনের মানুষ, উচ্চশিক্ষিতা ও চাকুরীজীবিও বটে। তাদের বিয়েও হয়ে গেছে। শিল্পীর গৃহ থেকে বোনেদের শ্বশুরবাড়ীর দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। বোনেরা আপদে-বিপদে মা ও দিদির খোঁজ নিতে আসে সর্বদাই। তারা আজও শ্রদ্ধা করে মা ও দিদিকে ঈশ্বররূপে। আমাদের সকলের প্রিয় শিল্পীর অবশ্য সব দায়িত্ব ও কর্তব্য সামলে নিজের সংসার আর গুছিয়ে তোলা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। আর তাই আজও সে অবিবাহিতা। কিন্তু তবুও ভীষণ আনন্দিত আজ সে। আমাদের সেই ছোট্ট শিল্পী আজ সমাজের চোখে আঙুল তুলে দেখিয়ে দিতে পেরেছে যে, চাইলে মেয়েরাও পারে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়ে নিজের আদরের পরিবারকে মাতৃস্নেহ ও পিতৃস্নেহে আগলে রাখতে।

<><><><><>

শুভ শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারনকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও অভিনন্দন।

দিলোয়ার হোসেন বড়ভূঁইয়া

সাধারণ সম্পাদক

এ.আই.ইউ.ডি.এফ, কেন্দ্রীয় কমিটি

ভালবাসা ব্যবসা হয়ে গেছে

- কবীর মজুমদার -

নিহা। আমার ভাবনার আধারে অতি পরিচিত একটি নাম। কিন্তু নিহাকে আমি বাস্তবে কোনদিন দেখিনি। হয়তো দেখবোও না। তবুও তার অস্তিত্ব আমি উপলব্ধি করি। বুঝি- সে একজন আছে, আমার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু না দেখা সত্বাকে ধরি কী করে? অথচ নিহাকে না পেলে না হয় এমন দশা আমার। আমি কি তবে মানসিক রোগী?

না, ডাক্তার অন্তত সে কথা বলেনি। ডাক্তার বলেছে- সব আমার উদ্ভট কল্পনা! আমি অদ্ভুত ভাবি। যার কোন মানেই হয় না। বেকার গাদা গাদা বই পড়েছে ডাক্তার। আমার রোগ ধরতেই পারিনি। হয়তো এই রোগে তাকে কোনদিন ধরেনি। আমি অদ্ভুত ভাববো কেন? নিহা যে রোজদিন আমাকে ফোন করে। আমি তার স্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। আমি বধির নই। সে খিলখিল করে হাসে, আমাকে হাসায়। তার নারী সৌন্দর্যের অহমিকা প্রকাশ করে। গোপন কথা আমাকে শোনায়। কখন কি হয়, সব জানি আমি। দশ-পনেরো মিনিট বা আরও বেশি সময় প্রেমালাপ করে। কোন একজন মানবী না থাকলে খামাকা কি এরকম হয়! হতে পারে? ভূতেরা মিছামিছি ফোনকরে বিল চুকাতে পারে না। আর মোদ্দা কথা, আমি ভূত-প্রেত এসব একেবারেই বিশ্বাস করি না। রাতের অন্ধকারে এমন কোন কাল নেই আমি একাকী ঘুরিনি। কোনদিন ভূতে ধরেনি। ডাক্তারও ভূত মানে না। শুধু পাড়ার মোল্লা ব্যাটায় চেঁচায়। তেল পড়া, বেলপড়া ইত্যাদি দিয়ে ভূত তাড়ায়। বলে কিনা আমাকে শ্মশান ঘাটের জিন-পরীরা কাবু করেছে! তাদের দেশে তুলে নিয়ে যেতে চায়। আমার মা-বাবা খুব ভয় পেয়েছে। রিসিভারের গলায় প্রকাণ্ড একটা তাবিজ বেঁধে রেখেছে। কিন্তু নিহার ফোন বন্ধ হয়নি। বরং আলাপের সময় বেড়েছে। আমার এক সুচতুর মাসিত্ব ভাই ফোনে আইডি কলার লাগিয়ে দিয়েছে। তবুও নিহা ধরা পড়ে না। তার ফোন আসা বন্ধ হয় না। নিত্য-নতুন নম্বর থেকে ফোন করে। টেলিফোন বুথে খোঁজ নিয়ে জানা যায়- সত্যিই কোন এক সুন্দরী ফোন করেছে। ত্রিশ চল্লিশ টাকা খেসারত দিয়ে গেছে। বাড়ির সবার মাথায় বিষ। মেয়েটার মতলব কী? কেনই বা ঘন ঘন ফোন করে আমাদের চাঁদের মত ছেলেটার মাথা খারাপ করছে! পিরিতির এত টান থাকলে একবার এসে দেখা করলেই তো পারতো। আমরা কেউ কি বাঘ-সিংহ যে জ্যান্ত ধরে খেয়ে ফেলবো! তাহলে...?

এই তাহলে ব্যাপারের কোনও সুরাহা নেই। আছে শুধু টেনশন! এখন ফোনের রিং এলেই সবার কান খাড়া হয়ে যায়। আমার মতো উদগ্রীব হয়ে সবাই নিহার অপেক্ষা করে। মাঝেমধ্যে যে অন্য কারোর ফোন আসে না এমন নয়। কিন্তু কোন ফোনই কারোর কপালের বলিরেখা এড়াতে পারে না। কয়েকদিন আগে দুধপাতিল থেকে বড়দির শাশুড়ি ফোন করেছিলেন। মা ফোন ধরেই- 'অলক্ষী, কুলোটা' গালি দিয়েছেন। পরে জানা গেল- বড়দির আট বছর পর একটা ফুটফুটে ছেলে হয়েছে। তবুও মায়ের মুখ থেকে হাসিখুশি গায়েব! পরে বড়দির শাশুড়িকে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলেছেন মা। শুনে তিনি বুদ্ধি দিয়েছেন- ছেলেটাকে তড়িঘড়ি বিয়ে দিয়ে দাও! কি সাংঘাতিক সমাধান রে বাবা! আমি বুঝি বিয়ে পাগল। বউ পাবার ধান্ধায় এসব কাণ্ড করছি। চিন্তায় পড়লাম। ভাবলাম- আমার দেশের প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতি দুজনেই তো বিয়ে থা করেননি। তাদের যখন চলছে, আমার চলবে না কেন? না চলার তো কোন কারণই নেই। তাছাড়া, আমি যে একটা বেকার। বিজ্ঞানে স্নাতক। কম্পিউটার ডিপ্লোমা সেরে চাকরির গড়পড়তা বাজারে কলার ভেলার মতো ভাসছি! বউ গলায় বেঁধে দিয়ে আমাকে ডুবিয়ে মারার চক্রান্ত কেন? আমি কি কারোর শাক-ডালে হাত দিয়েছি! আমি বাঁচতে চাই। বাঁচতে চাই শুধু নিহাকে নিয়ে। নিহাকে সঙ্গী করে আমাকে দ্বীপান্তরে কিংবা কালাপানিতে পাঠিয়ে দিলেও আমি রাজি। অথচ আমার কথা বুঝতে চাইছে না কেউ। কী সমস্যা ভাবুন তো!

বিগত কয়েকদিন থেকে আমার উপর কড়া নির্দেশ জারি হয়েছে- আমি যেন ফোন না ধরি। কিন্তু পারা গেল না। দুপুরে সবাই যখন খেতে বসেছে তখনই নিহার ফোন এসে যায়। ছোট বোন আর বড় ভাতিজা দৌড়ে গিয়েছিল ফোনের দিকে। হয়তো তাদেরও শখ হয়েছিল নিহাকে গালাগাল করার। তাড়িয়ে দিয়ে রোজগার অভ্যাস মতো আমি ফোন ধরলাম। প্রাথমিক প্রেমালাপের পর নিহা সেই রসের আলাপে মেতে উঠলো। যে ফুলে যে দেবতা সন্তুষ্ট হন, তাই আরকি! ধারেকাছে কাউকে ঘেঁষতে দিইনি। কনফিডেনসিয়াল ম্যাটার! নিহা জানালো- চারদিন পর আজ তার কোমরের ব্যথা উধাও। স্নান সেরে সে এখন বেশ সুস্থ। মেজাজও ফুরফুরে। যা খুশি গল্প করা যাবে। তার কথাশুনে আমি চাঙা হয়ে উঠলাম। ভোররাতে দেখা স্বপ্নটা মনে পড়ে গেল। বলেই ফেললাম- তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি। আমরা দুজন থর মরুভূমির ঝরঝরে বালুকারাশির উপরে অঙ্গাঅঙ্গি শুয়ে আছি। প্রেমের পরমানন্দে নানারকম গল্প করছি। ফোনে তো এই একটু-আধটু হয়, সেখানে কিন্তু এমন নয়। চরম বাড়াবাড়ি ছিল। তোমার পরনে তেমন রাখঢাকের কিছু নেই। আর আমার তো... তুমি বুঝতেই পারছো! নেই মানে একেবারেই নেই! ফিল্ড রিপোর্ট এমনটাই বুঝতে পারছো নিশ্চয়। হুম, এই বয়সে অনেক কিছুই বোঝা যায়। আমি তোমার গালে চুমো খাচ্ছি। তুমি আমার ওষ্ঠাধারে কামড়ে ধরেছো। তোমার ঠোঁট কাপছে আর আমার বদন! জীবনের প্রথম অনুভূতি! তাছাড়া, তুমি যে নিপাট সুন্দরী। ভারী বুক

আর ঠাসা নিতম্ব। অমিশার মতো মায়াবী মুখের হাসি, জুহির মত উচ্ছল হাসি! বিপাশার ডাইশে গড়া শরীরে শিল্পার মতো কামোদ্দীপক নাভি। বুঝতেই পারছো - সেই সময়ের কি দাবি! তুমি চোখ বুজে বৃষ্টির অপেক্ষা করছো। বাতাস বইছে তখন। যেন মরুঝড় উঠেছে তোমার আমার সর্বাঙ্গজুড়ে। আমি তালে তালে এগোচ্ছি। লজ্জায় তুমি সায় দিতে পারছো না। তবুও ছাড়ছো না...! জাপটে ধরে রেখেছো আমাকে।

আমার আর সইচে না। মরুভূমির উত্তাপে তরতর করে কাঁপছে দেহমন। নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি তোমার কবলে...। ব্যস, হয়ে গেছে। ঘুম ভেঙ্গেছে। সকালে উঠে স্নান করতে হবে। কি বিতৃষ্ণা তখন।

নিহা হু হু করে হেসে উঠলো। তারপর 'ধ্যেৎ' বলে একটা শব্দ করেই রিসিভার নামিয়ে রাখলো। পুরো কুড়ি মিনিট কেটে গেছে আলাপে। কই থেকে মা এসে ভাতওয়ালা হাত দিয়ে পটাস্ করে একটা চড় কষিয়ে দিলেন গালে। ব্যথা পেয়ে গালে হাত বোলাতে থাকলাম আমি। বুঝলাম দোষ নয়, স্বপ্নে গণ্ডগোল আছে। গাল হাতড়াতে লাগলাম। কয়েকটা ভাত আর মসুরি ডালের অ্যাসলা হাতে এলো। বুঝলাম বিপদ বাড়ছে।

রিসিভার এখন আর আমার ঘরে নেই। ঘর বদল হয়েছে, তবে নিহা বদল হয়নি। তারপরেও বার কয়েক ফোন করেছে। ওরা রিসিভ করে পরিচয় জানতে চেয়েছে। নিহা ছিনালি কণ্ঠে জবাব দিয়েছে- পরিচয় পরে। আগে ওকে ফোন দিন। আমি ওকে চাই। কিন্তু আমাকে সে পাবে কোথায়?

বাড়ির সবাই এক এক করে নিহাকে খুব গালমন্দ করেছে। নষ্টা, বেশ্যা ইত্যাদি অপশব্দে তুলোধুনো করে ছেড়েছে। নিহা রাগ করেনি। বলেছে- একদিন এসে মুখ দেখাবে! আমার বুকে নীলুয়া বাতাস দোল খেতে শুরু করেছে। আমি যেন সাত রাজার ধন পেতে চলেছি। ভালবাসা বলে কথা! একটা ঢোকে যেন হাজার গ্যালন ঠাণ্ডা জল খেয়ে ফেলেছি। খোদার কেরামতিতে খানিক দের হতে পারে, তবে আন্ধের নয় মোটেই। কিন্তু বড় একটা সমস্যা বেঁধে গেছে। ছোট বোন হুমকি দিয়েছে- আয় তোকে মুগুর দিয়ে পিটিয়ে বিদায় করবো। আমার ভাবি, যিনি হিসেব মতে নিহার বড়জা হবার কথা তিনিও ধমক দিয়ে বলেছেন- কী গো, তোর বাড়িতে বেটা মানুষের অভাব নাকি! মরদ মানুষের দরকার হলে বাজারে যা...!

অত্যন্ত দুঃখের কথা। চোখের সামনে আমি আমার ভালবাসার অপমান বরদাস্ত করি কীভাবে? অথচ বাড়ির মা-বোনের মুখেও ধরতে পারি না। শুধু আশা করতে পারি- নিহা একদিন আসবে। কাছে থেকে আমাকে ভালবাসবে। কিন্তু কবে যে ন'মন তেল হবে আর আমার রাধা নেচে নেচে ঘরে উঠবে! গাছে কাঁঠাল আর গোঁফে তেলের মতো স্বপ্ন আমার কবে যে সাঁকার হবে। ফোনটাও হাতের নাগালের বাইরে চলে গেছে। শেষমেষ নিহাও যদি যায়! না, এই অশুভ কথাটা আমি ভাবতেই পারি না। ভাঁওতা দেবার উদ্দেশ্য থাকলে নিহা ফোন করতো কেন ? নিশ্চয় তার দরদ আছে। আমার সাথে পীরিতের টান আছে। সে আমাকে ফাঁকি দিতে পারে না। ক্রস টেলিফোনে প্রথম যেদিন এই ভালবাসা জুটেছিল, সেদিনই আমার বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল।

টেলিযোগে ভালোবাসার বয়স দেড় বছর হয়ে গেছে। একা একা আমি অনেক ভেবেছি। নীরবে চোখের জল ফেলেছি। কিন্তু কোন কৌশলে নিহার পরিচয় ঠিকানা আবিষ্কার করতে পারিনি। নিহা সব সময় এড়িয়ে গেছে। বলেছে- আম খাবার দরকার হলে গাছগোনার মানে নেই। কিন্তু আমি যে আমের সুরতটাই দেখলাম না, স্বাদ-রূপ জানা হলো না। জিহ্বা কিন্তু লকলক করছে! কোন পদ্ধতিতে তাকে বগলদাবা করবো বুঝে উঠতে পারছি না। অংকের ফর্মুলা এখানে কাজ দেয় না। সে যদি সদয় না হয় তাহলে তাকে পাওয়া নামুমকিন। জানি, নিহা তার নাম বটে। বাবা-মায়ের নাম সে উচ্চারণ করেনি কোনদিন। তবে ছোটবোন আশার কথা বলেছে। সত্যমিথ্যা জানি না। এই নামে আদপে কোন মানুষ আছে কিনা তারই বা কী নিশ্চয়তা? তবে আমার মনে হয়, নিহা মিথ্যা বলতে পারে না। আর এই মেয়ের এরচেয়ে সুন্দর নাম হতেও পারে না। আমার ধারণা যদি ভ্রান্ত না হয় তাহলে তার হদিস আমি বের করবোই। এ কোন কঠিন কাজ নয়। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধবী আছে। শুধু উদ্যোগটা আমাকে নিতে হবে। কিন্তু কীভাবে শুরু করবো?

চিন্তায় মাথা ধরেছে। চোখে নিয়মিত জল পড়ছে। এই চোখের জলে ভালবাসা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যাবে না তো? চোখ দুটো নিহাকে পরখ করতে চায়। নিহা আমাকে বলেছে- আমি তোমাকে একদিন সারপ্রাইজ দেবো। আমি সেই সারপ্রাইজের অপেক্ষায়। জানি নিহা আসবে, আমি তাকে দুচোখ ভরে দেখবো। এরমধ্যে যদি আমি অন্ধ না হয়ে যাই। হবার একটা চান্স আছে। ডাক্তার বলেছে এভাবে চোখে জল পড়তে থাকলে আমি অচিরেই অন্ধ হয়ে যাবো। ডাক্তারের কথা আমি বিশ্বাস করি না। ও রোগ ধরতে পারে না। প্রায় সময় তার রোগ নির্ণয় ফেল মারে। আর ও বোধহয় নকল করে পাশ করেছে। শ্যালা, চোখের জলে অন্ধত্ব আছে বলতে পারে; কিন্তু আমার ভালবাসা আঁচ করতে পারে না। কিসের ডাক্তার ও। কিছুই বুঝতে পারে না। সাধে কী আর লোকে বলে এমবিবিএস মানে মা-বাবার বেকার সন্তান।

আমার উপর সব সময় নজরদারি চলছে। কেউ কেউ বলছেন আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি। ডাক্তার বলে দিয়েছে জল আবহাওয়া বদলানো দরকার। বাবা বুদ্ধি করেছেন আমাকে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেবেন। মা ভাবছেন- তার আত্মীয়ের বাড়িতে পাঠাবেন। আমাকে নিয়ে দু-টানায় রয়েছেন তারা। আমি কিন্তু মানসিক বেকারগ্রস্ত নই। খাই-দাই গল্প করি। সুযোগ পেলে আড্ডা দিই। তবুও কেউ বুঝতে চায় না আমি স্বাভাবিক। তবে আমাকে যদি ওরা জায়গা বদল করে তাহলে

শ্রদ্ধাঞ্জলি...

জয়নাল উদ্দিন লস্কর

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান"
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই হৃদয়ের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।

লায়ন্স ক্লাব অব লালা

সেখানেই করুক, যেখানে একটা ফোন থাকে। আমার না এই একটাই ইচ্ছে। কিন্তু রক্ষা হলো কই?

এক নদী চোখের জল ফেলে বাড়ি থেকে বিদায় হলাম আমি। আমাকে এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হল যেখানে ফোন তো দূরের কথা, ফোনের নাম-গন্ধ নেই। ঘটনাটি এতটাই দ্রুত ঘটলো যে এরমধ্যে নিহা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেনি কিংবা আমিও তাকে জানাতে পারিনি। সুতরাং, চোখের জলই ভরসা।

আমি বেশ মনমরা হয়ে আছি। ভালবাসায় বোধহয় এভাবেই থাবা পড়ে অথবা কপাল বদলে যায়। কিন্তু মন কি বদলাতে পারে? আমি মধ্যে মধ্যে স্বপ্নে বেড়াই। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করি। দোকানে, চা স্টলে আড্ডা দিই। একটা মানুষ আমাকে পাহারা দেয়। বুঝি ওটা আমার বাবা মায়ের কানমন্ত্র দেওয়া জাসুস। আবহাওয়া বদল হয়েছে কিনা জানি না, তবে আমার জীবনটা অদ্ভুতভাবে ওলট-পালট হয়ে গেছে।

আমি মনমরা মানুষ হয়ে গেছি। আমার ভাঙ্গা মন বদলে একটা সুস্থ্য সবল মন প্রতিস্থাপন দরকার। আমার ভালবাসার পাগলামিও শেষ। একদিন বাড়িতে এসে বোনের মুখে শুনলাম - আপদ খাল্লাস! ভাবলাম- কী ব্যাপার হে! আমাকে ভালবাসার অপরাধে নিহা খুন হয়েছে কিনা! খবর নিতে চাইলাম। কয়েকটা নম্বর আমার কাছে ছিল। কোনটাতেই নিহাকে পাওয়া গেল না। হতাশ হয়ে পড়লাম। সব শেষ। তারা তাদের মিশন সাকসেস করে ফেলেছে। আমার ভালবাসা হারিয়ে গেছে। আমি জিন্দা লাশ।

একদিন ভোরবেলা। ফোনের ডাকে ঘুম ভাঙলো। আমার আগের সেই উন্মাদনা আর নেই। বাড়ির কেউ-ই আর আমাকে নজরে রাখছে না। বুঝে গেছে - আমি দেবদাস হয়ে গেছি নতুবা প্রেমের ভূত মাথা থেকে নেমে গেছে। ধীরপায়ে হেঁটে ফোন ধরলাম। জানলাম সে নিহার ছোট বোন আশা। তার কথা থেকে বুঝলাম নিহা আর আমার জীবনে নেই। ভালবাসা শুধু ভালদাগা নয়। ভালবাসা এখন এক ধরণের ব্যবসা হয়ে গেছে। বিশ্বাস করলেন তো ? আমি মানসিক রোগী নই। আমি ছবি আঁকি। গল্প-কবিতা লিখি...

একটা অঘটন ঘটেছিল
আমার জীবনে
ভালবাসা জুটেছিল
ক্রস টেলিফোনে
কত কথা কত সুখ
শুধু কানে কানে
কার গলা সে কেমন
দেখিনি দু'নয়নে
রোজ সকালে বিকেলে
গল্প হতো ফোনে
মাঝে মাঝে আড়ি হতো
প্রেমের অভিমানে
হঠাৎ একদিন ভোরবেলা
শেষ কল আসে
নিহা'কে ভুলে যায়ও
সে জয়কে ভালবাসে
দু'জনের বিয়ে হবে
শনিবার ত্রিশ জুন
আর যদি ফোন করো আমি
আমি আছি ছোটবোন
কার কথা কে শুনে
এই বুঝি ভালবাসা
বড়বোন ব্যথা দিল
ছোট বোন আশা

<><><><>

সন্ধ্যাতারা

- বিদ্যুৎ চক্রবর্তী -

ওপারে একদিন - মাথায় রেখে সন্ধ্যাতারা
আল ধরে ছুটছি আলী সাহেবের সড়ক ধরব বলে।
এমন সময় পেছন থেকে - কে যেন?
ফিরে দেখি শ্মশ্রুগুম্ফবিহীন স্বয়ং
আলী সাহেব
এসে প্রায় ছুঁয়েই ফেলেছেন আমাকে -
বললেন - এই ধূপছায়াতে ছুটছ কোথায় ভায়া?
আমাকে তখন বোবায় ধরেছে, নৈঃশব্দ্য আবৃত
আমতা আমতা করে বললাম - জলে ডাঙায়।
চমকে উঠি ততক্ষণে, এ কী বললাম আমি ?
এ দ্বন্দমধুর শব্দযুগল - এ যে অবিশ্বাস্য।
ধুতির কোঁচাকে আরোও খানিকটা উঠিয়ে নিয়ে
ময়ূরকণ্ঠী ফতুয়া পরে আলী সাহেব - হনহন।
আমিও মেলাই পা। কথায় কথায় আঁধার বাড়ে,
বাড়ে কথার চতুরঙ্গ। আলী সাহেবের মুখে তখন
একের পর এক চাচা-কাহিনি, নানান অনুষঙ্গ।
বললেন - আমি একটু চালাই পা
বড়বাবুকে সঙ্গে নিয়ে টুনি মেম-এর বাড়ি যাব।
সেখানে বসে আছে তুলনাহীনা শবনম।
আমার নামে কী জানি কী মারছে রাজা উজির
ধরতে হবে তার বেবাক ফন্দিফিকির।
বহু দূর এগিয়ে গেছেন আলী সাহেব,
আমি সন্ধ্যাতারার আলোর ছটায় ছুটছি অফুরান
জোর দিয়ে যাই হাঁক - হে মহীয়ান।
আমি জড়িয়ে পড়ি অস্ফুট কিছু নির্বাক শব্দবন্ধে
ঘেমে নেয়ে ভেঙে যায় ঘুম
আমার স্বপ্নচোখের তারায় শুধু এক
অবয়বসত্যদ্রষ্টা, যুগদ্রষ্টা,
প্রিয়দর্শী এক মুসাফির
আমার সত্যপীর।

<><><><><>

কালো ভ্রমর

- শিপ্রা মাজী -

আঁধার রাতে নেই আলো
রঙ তোমার বেহাত কালো।
চাঁদনী ছাড়া অন্ধকার রাতে
পাও তুমি কিভাবে দেখতে?
জানালা দিয়ে ঢুকলে ঘরে
ভোঁ ভোঁ আওয়াজ করে।
আওয়াজ শুনে ভাঙ্গে ঘুম
পড়েছে রাতে তোমার ধূম?
শুনেছি আমি গান তোমার
গানের ভাষা বোঝাও ভ্রমর?
খাচ্ছ ধাক্কা এখানে ওখানে
ভাবছো মনে বাসা এখানে?
পথভ্রষ্ট হয়ে পড়েছ ঢুকে
বসবে নাকো আমার বুকে।
কাটাও রাত মনের সুখে
ঘরের জিনিস দিওনা মুখে।
চুপচাপ থাকো ঘরের কোণে
সকাল হলে যেও তুমি বনে।
গুন গুনীয়ে সেথা গান গাও
ফুলের বাগানে সব মধু খাও।

<><><><><>

জীবনের ঝরা পাতা

- অগ্নিক ধর -

কত দিন চলে গেছে
সময় বয়ে গেছে ঝড়ো বাতাসের মত-
খেয়াল করিনি আমি ।
শুকনো পাতা হয়ে জন্মেছিলাম
জীবনের ঝরে যাওয়া সেই শুকনো পাতা।
কোথাও কোনোও সবুজের
চিহ্ন আছে কিনা,খুজেছি বহুবার ।
কোথাও কি লেগে আছে কোনও দাগ
কাউকে দেখাবার !
সবই গেছে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে
চিরতরে হারিয়েছে তার সবুজ প্রানের আশ।
আজ যখন চেতনার সেই জানলা খুলে দিলাম,
অতীতকে উজাড় করে দিলাম বাস্তবের
দরবারে-
ধুলো বাতাস, সদ্য স্ফুটিত জুঁই ফুলের
গন্ধ-মাখা, স্নিগ্ধ বাতাস
উড়িয়ে নিয়ে গেল জীবনের সব নিষ্প্রান
শুকনো পাতাগুলো ।
জন্ম নিল আমার
জীবনের প্রাচীন ডালে
সদ্যজাত ছোট শিশুর মত সবুজ কচি
পাতা।

<><><><><>

শারদীয়া

- তপন মাইতি -

কেটে গেছে ঘোর বর্ষার রেশ
পুজো পুজো গন্ধ এখন
আর সুন্দর পুষ্প বৃষ্টিতে
তোমার কথা মনে পড়ে ভীষণ
কলেজ ক্যান্টিন গানের অন্তাক্ষরী
সরু কাজলের টান মুচকি হাসি
সিরিসিরি ছাতিম গন্ধের ভেতর
ফুটে ওঠে ছবির মতন
প্রথম লগ্নের শারদীয়া....

<><><><><>

গৌরবের ২৫ বছর

অনির্বাণশিখা

নির্ভীক ও স্বতন্ত্র ধারার সাপ্তাহিক পত্রিকা

যোগাযোগের ঠিকানা

প্রযত্নে ঃ নুরন্নল হুদা চৌধুরী, (কার্যবাহী সম্পাদক)
হাইলাকান্দি রোড্, লালা, ৭৮৮১৬৩, জিলা - হাইলাকান্দি (আসাম)
মোবাইল নং - ৯৪০১৯২৬২৩৯ / ৯১০১৫১৪৭৬১

M/S. PRIME TIME INTERNET CAFE

Flight Tickets, Railway Ticketsm Passport, Pancard, E-mail, DTP, Printing, Downloading, Scanning, Online Apply, Computer Sale & Reparing and All kinds of Mobiles & DTH Recharge Available.

Contact : 9854774471 / 9101514761

খুঁজে ফিরি শঙ্খ-ঝিনুক

- মীনা কুমারী দেবী -

সমুদ্রের বালুচরে হাঁটতে হাঁটতে,
খুঁজে ফিরি শঙ্খ-ঝিনুক,
যে পাঞ্চজন্য শঙ্খের নাদে ;
কেঁপেছিলো কুরুক্ষেত্রের মেদিনী !
খুঁজে ফিরি সেই শঙ্খে---
বিশ্বযুদ্ধ অনেক আগেই
শুরু হয়ে গেছে---
শঙ্খ বাজিয়ে বন্ধ করার
কাজখানাই কেবল বাকি !
তারপর কুড়িয়ে আনবো
সেই ঝিনুক--যাতে মুক্তো আছে!
সেই মুক্তো দিয়ে সাজাবো
এ ধরনী----
যদি যুদ্ধে--অস্ত্রের আঘাতে
ঝরে পড়ে না--শোণিত!
কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে এলো,
শুনছি না কেন,
পাঞ্চজন্যের নাদ খানি ?
শুধু শিবিরে যাবার অপেক্ষায় আছি---
রণক্লান্ত আজি আমি !

<><><><><>

আমাদের বরাক

- ইয়াহইয়া বড়ভূইয়া -

যেখানে দেখেছ নদীর জল সাই সাই করে চলছে
ভাদ্র-আশ্বিনে সোনালী রঙে মাঠ ঝিকঝিক করছে,
কৃষকের মুখে বাংলা গান আর গাল ভরা পান
কোথাও নালা, মেঠো টিলা আর কোথাও চা-বাগান।
ওটা আমাদের বরাক, সবুজ অরণ্যে চারিদিক ঘেরা
দু'চালের ঘর, পাশে ছোট পুকুর সামনে বাঁশের বেড়া,
প্রভাতে কোকিল পাখির কুহু, মসজিদে হয় আজান
মন্দিরে ঘন্টা বাজে, ফুলে ভরা থাকে সব বাগান।
সকালে সোনালী সূর্য আর রাতে চাঁদের কিরণ
বেশ ভালোই লাগে আমাদের বরাকের এই ধরন,
স্কুল মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রীর নানান গল্পে পথচলা
কখনো সাইকেলের ক্রিং ক্রিং পথ দাও বলা।
দুপুরে রাখাল ছেলের বাড়ি ফেরা গরু-বাছুর নিয়ে
বিকেলে বাজারে হাট বসে কত কিছু দিয়ে,
কোথাও দেখেছ চায়ের আড্ডা টঙের দোকানে
আবার কোথাও নানান খেলা মাঠের মাঝখানে।
ওটা আমাদের বরাক, ওখানে সহজ সরল লোক
বিপদে প্রায়ই পাশে থাকে, বুঝে অন্যের দুখ,
দক্ষিন আসামের তিনটি জেলা পাহাড়ের গায়ে
উপত্যকা বরাক ঘুরতে সহজ গাড়ি ট্রেনে নায়ে।

<><><><>

ভালবাসা তবু আজ ব্যর্থতার পরিহাস

- শুভাশিস সাহু -

প্রেম তুমি ফিরে যাওয়ার
হাওয়ার মতো ব্যথিত রাতে।
এ বিরহ ব্যথিত জীবনে এসো নাকো তুমিআর।
কী হবে ভালোবেসে, এ কঠিন স্তব্ধ রাতে।
যেন সংকল্পবদ্ধ হই, তবেই বা কী লাভ?
কঠিন মুখ আর
উত্তাপের সহস্র রাত কেটে যায়।
ভালবাসা তবু আজ ব্যর্থতার পরিহাস।।

<><><><><>

মা

- মোঃ কমরুল ইসলাম -

তুমি চলে গেলে মেঘলা আকাশে
নিরীহ চোখ, কনকনে শীতে, রাতে কুয়াশা জমে
স্মৃতির নোনা জলে, রেলস্টেশনে দাড়িয়ে
নিঃসঙ্গ আমি, শুধু কলাভবন খোঁজে।

যখন তখন নেমে পড়ি
কে যেন আমায় নামিয়ে দেয় -
যেন এই এক অচেনা শহর।

তুমি তো স্বপ্নের দেশে, সেই বাঁশ বাগানে
হৃদয় কাঁদে অন্ধকারে, আত্মকেন্দ্রিক ভবে
কেউ দেয় না বাড়িয়ে হাত-
তুমি যে লুকিয়ে রইলে অনাবাদী ভবে।

চার দশক ভয় সংসারে, অবিরাম যেন লড়াই
ক্লান্ত, নির্জীব, নির্ঘুম সৈনিক, পায়নি সাতরঙ্গা সকাল
সুবাসিত ফুলে বাসর রাতে বালিকা বুধ কখন।

মনে হয় আজি, সূর্যের রঙ্গের চেয়েও তুমি অনন্য
তুমি মেঘলা আকাশে নয়, তুমি নীল আকাশে -
তুমিই ছিলে ঝর্নাধারার গতিময়তা
শ্রদ্ধা ভালবাসার তুমি আমার এক লিখিত কাগজ।

বেদনার স্মৃতি হয়ে তুমি আমায় কাঁদাও
পূর্নিমার চাঁদ উঠে না চিত্তে
সব কিছু নিমিষে অন্ধকার -
শালিক নিয়েছে কেড়ে নিদ্রা
নিঃশব্দ ভবে যেন শুধু অন্ধকার।

<><><><><>

শারদীয় দুর্গাপুজা ও আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

বাহারুল ইসলাম মজুমদার
আমালা, হাইলাকান্দি

শারদীয় দুর্গাপুজা ও আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

আব্দুল আহাদ লস্কর
কেন্দ্রীয় সভাপতি, বরাক
ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্ট ফ্রন্ট

ভালোবাসার জয়

- রফিক উদ্দিন লস্কর -

সাতদিন হলো শ্রাবণীর জ্বর, তা কিছুতেই নাহি কমে
মনে মনে ভাবে এইবার নাকি ধরিয়াছে তাকে যমে।
ডাক্তার, বদ্যি দেখিয়েছে স্বামী, ক্ষমতার ভিতরে যা
ওষুধে না ধরে বরং বাড়ে,দুর্বল শ্রাবণীর কবরে পা!
সন্তানহীন সংসার তাদের বার্ধক্য এসে করেছে ন্যুব্জ
অভাবের ঘরে সবাই সরে,একটু ও কেউ লয়নি খোঁজ।
বাপের বাড়িতে শ্রাবণী ছিলো সবার প্রিয় ননীর পুতুল
ভালোবেসে বিয়ে, জীবনে তার সবচেয়ে বড়ো ভুল?
সেই ছোটোবেলা একবার যখন হয়েছিল তার কাশি
কতো ডাক্তার এনেছিলেন ঘরে, বাপ, ভাই ও মাসি।
পুরানো দিনের সকল সুখের স্মৃতি শ্রাবণীর মনে পড়ে,
সে আজকের দিনে একাকী ঘরে অসুখের সাথে লড়ে।
পতিকে সে ভালোবাসে কতো প্রকাশ করা বড্ড কঠিন
দুঃখ তারা ভাগ করে নেয় জীবনে নেই হতাশার চিন।
পতি যে তার সবজির দোকানী, বাড়ির পাশেতে হাট
ঘর হতে চাইলে দেখা যায় তারে মাঝখানে এক মাঠ।
সকাল হলেই পসরা মেলে জীর্ণ শরীর মানেনা বাধা
হাটবারে সে করে না দেরি, শীত, গ্রীষ্ম হোক না কাদা।
এমনি করে শ্রাবণীর সাথে চল্লিশ বছর করেছে পার
দু'জন দু'জনকে শুধু ভালোবাসে খামতি হয়নি কার।
সাতদিন পরে শ্রাবণীর জ্বর বাড়িলো দ্বিগুণ মাত্রায়
এইবার নাকি পথ ধরিবে সে, তার অন্তিম যাত্রায়?
শ্রাবণীর শোকে ফোটে না কথা, অশ্রুতে ভিজে বুক
অভাগা পতির জীবন হতে চলে যাবে কি সব সুখ?

<><><><><>

সহজাত প্রবৃত্তি

- চিরঞ্জীব দাস -

বৃষ্টি এলে নাচে শিশু আর নাচে গাছালী।
ভিজছে জলে গাছের পাতা পড়ছে মাথার উপরে
ওরে ভুলু ফিরে আয় সর্দি কাশি আসবে যে।
শুনে কথা তিড়িং তিড়িং নাচে খুবই আনন্দে।
ভালোলাগে ছন্দে নাচা ফিরে দেখি শিশুরে।
আমরা যত বুড়ো বুড়ী ভুলে গেছি অতীতকে।
স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা ভুলে গেলে চলবে না।
আজও আমি মনে মনে খুঁজে ফিরি আমারে?
শুন তোমরা পিছলা উঠোন চিড়া চ্যাপ্টা পড়লে যে
অসুখ বিসুখ এলে
তখন ওষুধ খেতে আমার কাজ
গলায় ধরে কান্না সুরে আমায় ধরে বলবে আজ।
দুষ্টমিতে বাদল দিনে
ভিজবে নাতো সুমতিতে।
একটা সময় আসবে যখন দেখবে তুমি আমি নাই।
অগোছালো শিশুর খেলা
দেখতে ভালো কাজের কাজ।
হেলেদুলে শিশু নাচে তুমি নাচ ভাবেতে।
লিখছি ছন্দে পড়বে আনন্দে বৃষ্টির
জলে শিশুর খেলা।

<><><><>

মুখোমুখি

- সমীর চক্রবর্তী -

চলার পথেএলোমেলো ভুল বানানগুলি
উৎপেতে রয়েছে বহুদিন।
শহুরে ব্যস্ততার ভিড়ে ছিন্ন চিত্রগুলি
বিস্তীর্ণ ডুবে ছিল মগ্নতায়,
এই যে হেঁটেছি সারাদিন, অতদিন
ভিক্ষুকের প্রায় শূন্য চেহরায়,
ঝরে পড়া পাতার ন্যায়
যতটুতু ঝরার ঝরুক কিংবা
বেঁচে থাক চন্দহীন পথে।
পাখিরা তো ভেসে চলে সুখ ও দুঃখের পথে
তবু তো তারা আলোছায়ার পথে,
জীবন মুখোমুখি।

<><><><><>

গল্প

- আলমগীর হোসাইন -

চাঁদের বুড়ির গল্প
শুনেছি মোর শৈশবে
বাড়ীর উঠোনে
শীতল পাঠীতে বসে
জোছনা ছড়ানো রাতে।
ঘুম পাড়াতো মা আমায়
কতো আদর সোহাগ করে
চাঁদের পানে হাত উঠিয়ে
চাঁদ মামা আয় বলে।
আজ মা নেই
বট বৃক্ষের শীতল ছাঁয়ায়
রূপ গল্প বুড়ির কথা বলে
এই দুষ্ট ছেলেকে
ঘুম পাড়াবে কে?

<><><><><>

ক্ষুধার্ত মানুষের কান্না

- নীহার রঞ্জন দেবনাথ -

জগৎ জুড়ে চলছে কেবল দুর্নীতি অপকর্ম,
অসৎ লোকে রেহাই পাচ্ছে ব্যবহার করে ধর্ম।
বস্ত্রহীনা ক্ষুধার্ত লোকের করুণ কান্নার ধ্বনি,
উৎপীড়নের ক্রন্দন রোল বাতাসে উঠছে রনী।
কল কারখানা বন্ধ আজ, কাজ নেই কারো হাতে
হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কষ্ট পায় আজ ভাতে।
ক্ষেতের ফসল বিক্রি করতে উচিত মূল্য নাই,
কেমন করে বাঁচবে কৃষক ভাবছি বসে তাই?
ভাতের হাড়ি চুলায় বসায় ফুটায় তাতে জল,
ক্ষুধায় কাতর বাচ্চার সঙ্গে করছে মায়ে ছল।
হিংস্রতায় মানুষ এখন অধম পশুর থেকে,
মানুষ আমি কেমন করে লজ্জা রাখি ঢেকে?
নিভৃতে নীরবে মন কাঁদে বসে ঘরে,
ভাবছি আমি এই সমাজে বাঁচবো কেমন করে?
সন্ধ্যাতারা চাঁদের মত হাসতে চায় এ মন,
নিদারুণ ওই অভাব আমায় তাড়ায় সারাক্ষণ।
সুকৌশলে সমাজপতি হয়েছে আজ ধনী,
আমরা গরিব সারাজীবন হয়ে থাকি ঋণী।
জেগে উঠ সর্বহারা এবার লড়াই হবে,
ন্যায্য পাওনা এবার আমরা ছিনিয়ে আনবো সবে।
বৈষম্যতা সমাজ থেকে করবো পরিহার,
আমরা মানুষ সবার জন্য সমান অধিকার ।।

<><><><><>

বিক্রম গেছে মামাবাড়ি

- বিপ্লব গোস্বামী -

বিক্রম গেছে মামাবাড়ি
প্রজ্ঞান গেছে সঙ্গে
ঘুরছে আর তুলছে ছবি
কাটছে দিন রঙ্গে।

রাস্তায় পেল তিরঙ্গা পয়েন্ট
থামল শিবশক্তি মোড়ে
মামার দেশ দেখতে বেড়ায়
মোড়ের কাছে আর দূরে।
অশোক স্তম্ভ এঁকে দিল
মামার উঠোন জুড়ে
দিব্যি তাদের কাটছে দিন
দক্ষিণ মেরু ঘুরে।
মামাবাড়ি থাকবে তারা
চৌদ্দটি দিন রাত
মামাবাড়ির তথ্য দেবে
করবে বাজিমাত।

<><><><><>

আগমনি

- নীহার রঞ্জন পুরকায়স্থ -

শিশিরে -শিশিরে, শারদ -অম্বরে,
আসিবে মাগো মর্ত্য -ভুবনে ;
ঝরিবে শিউলি, ফুলদল -দলে --
মধুকর নাচিবে, শতদল বনে !
কণ্ঠে গাহিবে, ভোরের কোকিলা ;
মায়ের শুভ আগমণে ;
কাঁশ ফুলের, আনন্দ হাসিতে --
নৃত্য -তরঙ্গে, উল্লসিত তটিনী -সনে!
মেঘমালা, বলাকার মেলায়
মেলিবে ডানা, মধু -সমীরণে;
কাঁসর ঘন্টা আর ঢাকীর -তালে --
শঙ্খ -নিনাদিবে, শরতের লগনে !
এসো মাগো, ভুবন -মোহিনী --
কৈলাশ হতে --পিতার -ভবনে ;
মায়ের -আগমনে, শান্তি আসিবে --
মাগো, তোমার দরশনে !!

<><><><><>

কাশবনে

- মতিউর রহমান জীবন -

গগন জুড়ে মেঘের ভেলা
শুভ্র মেঘে করছে খেলা
শরৎ আকাশ জুড়ে,
প্রেমিক জুটি কাশের বনে
শুভ্রতা আজ হৃদয় মনে
ডাকছে মধুর সুরে।
কাশের বনে পাখির ছানা
ধরতে গেলে সদাই মানা
দেখো দু'চোখ ভরে,
গাছের ডালে শিউলি ফুটে
দু'হাত ভরে নিচ্ছি লুটে
সুবাস মনের ঘরে।
চাঁদের আলো নদীর বুকে
পরাণ ভরি স্বপ্ন সুখে
গাঁথি শিউলি মালা,
শারদ রাতে গগন জুড়ে
তারকারাজি ডাকছে সুরে
বাড়ে হৃদয় জ্বালা।
ঝিল ভরেছে শালোক ফুলে
ঢেউয়ের তালে শাপলা দুলে
শরৎ ঋতুর খেলা,
মাছের রাজ্য হাওর পাড়ে
ভাটির সুরে হৃদয় কাড়ে
ভাসে রঙিন ভেলা।

<><><><><>

বউ-শ্বাশুড়ি

- মোঃ মেহেদী ইকবাল জয় -

বউ শ্বাশুড়ি যদি হতো
মা ও মেয়ের মতো,
সংসারে আর দ্বন্দ্ব বিবাদ
হবে না তো ততো।
শ্বাশুড়ি নয় মায়ের মতো
তা সকলের জানা,
বউটিও নয় পেটের সন্তান
বউটি তাই দেয় হানা।
নিজের রক্তে আছে স্নেহ
পরের রক্তে রিক্ত,
দু'য়ের মাঝে এতো কেন
ব্যবধানের তিক্ত।
অনেক নারীই বউমা হলে
কয় শ্বাশুড়ি দুষী,
যখন তিনি শ্বাশুড়ি হোন
বউকে দোষে খুশি।
বউকে যদি শ্বাশুড়ি মা
মেয়ের মতো দেখে,
মিলেমিশে কাটবে জীবন
বউমা বলে ডেকে।

<><><><><>

গরম রক্ত

- দেবব্রত মাজী -

বয়স বাড়লে রক্তের গরম একটু কমে
ছোটবেলায় গরম রক্তে খেলা জমে।
বুদ্ধিদীপ্ত প্রাণী যায় না কিসি সে কম
অবুঝ প্রাণীও দেখায় গরম তৎসম।
যদি দেখে কেউ দিচ্ছে পাড়ায় দখল
ছোটরা করতে থাকে তাদের নকল।
গরম রক্তে সবাই ভাবে নিজে শের
দেখলে অন্য শেরকে করে হেরফের।
অন্য পাড়ায় দেখায় না নিজের শোভা
সেখানে গিয়ে সেজে থাকে যেন বোবা।
সর্বস্তরের জীবের থাকে একই প্রবণতা
এরাই আবার দেখাতে থাকে কোমলতা।
মানতে তবে হবে আছে বুদ্ধি সকলের
তবে কেন বাড়াই সবার মুশকিলের?
দেখলেও দেখতে পারো প্রয়োগ করে
আশার ফল না পেলে পড়বে দূরে সরে।

<><><><><>

জিজ্ঞাসা

- আছিয়া মজুমদার -

সাগরের ঢেউ সৃজনাত্মক না ধ্বংসাত্মক
আজও জানে না কৃষক
অগ্রহায়ণের বৃষ্টি অপ্রত্যাশিত নয়,
তবুও সে মেনে নিতে পারে না,
বেদনায় ছেয়ে থাকে অষ্টপ্রহর।
বিষন্ন দেহমন অশ্রু ভেজা চোখ,
বসে আছে ক্ষেতের পাশে দেখছে,
শুধু দেখছে, নষ্ট হচ্ছে রোদে পোড়া
ঘামে ভেজা সাধের ফলন।
হে বিধাতা, কী ছিলো আমার অপরাধ!
বলেছিলাম ছলনা করো না আমার সাথে,
উজাড় করে দিয়ে কেন কেড়ে নিলে সব?
কেন প্রহসন করো?

<><><><><>

পুজোর বার্তা

- নিখিল মিত্র ঠাকুর -

কাশ ফুটেছে নদীর ধারে,
ছাতিম আছে পুকুর পারে,
উঠোন তলে শিউলি ঝরে,
দুর্গা পুজো আসছে।
শিউলি ছাতিম ছড়ায় গন্ধ,
অন্ধ বাউল গাইছে ছন্দ,
বাতাস বইছে মৃদু মন্দ,
আমার বাংলা হাসছে।
দীঘির জলে কমল দোলে,
কানে কানে শরৎ বলে,
পূজো নিয়ে এলাম চলে,
এসো সবাই ছুটে।
নীল আকাশে মেঘের ভেলা,
ঘাসের আগায় হিমের খেলা,
পূজোর বার্তা সারা বেলা,
নাও তো মজা লুটে।

<><><><><>

ক্ষমা করো প্রভু

- স্নেহলতা মন্ডল -

জীবন খাতার প্রতি পাতায় কত হাসি কান্নালেখা
সেই কথাটা লিখতে বাকি যে পথটা হয়নি এখনো দেখা।
মানব জাতিতে নিয়েছি জনম হয়েছি শ্রেষ্ঠ সেরা জীব
করছি গোপন কত তথ্য হিসেব রাখছেন সব শিব।
ভাবছি বসে দেখছে না কেউ আমার সকল কর্ম
শ্রেষ্ঠ সেরা জীব আমি কি করবে আমায় ধর্ম!
আত্ম অহংকারে পড়ে আজ করছি কত ভুল
ভুলেছি তাই ভালোবাসায় ফোটে সুখের ফুল।
স্বার্থ আমায় রেখেছে বেঁধে হয়েছি আজ অন্ধ
দেখিনি ভেবে শেষ বিচারে সব দ্বার হবে বন্ধ।
মানবজাতি হয়েও আমি তবু নেইকো কোনো হুঁশ
মান আর হুঁশ হারিয়ে আমি হয়েছি অমানুষ।
ধর্মটাকে বুঝিনি কভু করেছি শুধু কর্ম
ভুলে গেছি মানুষ গড়ার শ্রেষ্ঠ মানব ধর্ম।
অর্থ-সম্পদ সবই আছে তবু হয়েছি আমি একা
জানি না বেলা শেষে পাবো কিনা প্রভুর দেখা।
শেষ বিদায়ে প্রভুর কাছে এই মিনতি করি
জ্ঞানচক্ষু দাও গো আমায় তোমার চরণ ধরি।
অহংকারে ভুলেছি তোমায় বুঝিনি কভু ক্ষণে
মরমে মরমে মরছি আজ অতি সঙ্গোপনে।
প্রভু তুমি অতি প্রিয় বুঝেছি আজ মনে
সকল ভুলের ক্ষমা করে, নাও গো কাছে টেনে।

<><><><><>

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

- শিবানী গুপ্ত -

অমর কথাশিল্পী অসীম গুণী
তুলনা নাই তোমার সমতূল
ভাষা-উপমায় দিতে নারে সাধ্য
সব ই ---অ--প্রতুল
'পল্লী সমাজে'র প্রতি ঘরে ঘরে
তোমার আসন হৃদয় --মন্দিরে
কতো না গাঁথা থরে--বিথরে
লিখেছো নিপুণ লিখনী তে
'নিষ্কৃতি','স্বামী','চরিত্রহীন','দত্তা',
'রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত'গৃহদাহে'-
অচলার দৃপ্ত অপরূপ সত্ত্বা'
'বামুনের মেয়ে'র করুণ গাঁথা-'
কমলাকান্তে-র রুক্মিণীর ব্যথা'
সর্বত্র দেখি যেন আপন কাহিনী
মনে বেদনার সুর বাজে রিনিঝিনি
মনে হয়, চিনি !---তারে চিনি!
কথার যাদুতে ছেয়ে আছো গুণী
আপন বৈভবে -স্বমহিমায়
জন্মদিনে তোমারে প্রণতি
কুর্নিশ জানাই তোমার পায়।

<><><><><>

হারানো মানুষ জড়ানো স্মৃতি

- কবীর মজুমদার -

কিছু তারিখ, কিছু সময়, কিছু মুহূর্ত আর কোন কোন মানুষ আছেন যাদের কখনো ভোলা যায় না। যাদের কথা লিখে শেষ করা যায় না। তেমনি এক কোমল হৃদয়ের ব্যক্তি বিশেষ ছিলেন জয়নাল উদ্দিন লস্কর।

সবিনয়ে বলতে বাধ্য, আমার এই লেখা জয়নাল উদ্দিন লস্করের মূল্যায়নের কোনও প্রচেষ্টা নয়। তার ব্যক্তিত্ব এবং কাজ নিয়ে দু-কথা লিখতে পারি, তবে তার মূল্যায়নের স্পর্ধা আমার নেই। আমি সেদিকে যাবো না এবং পারবোও না। শুধু মানুষটিকে যখন যেভাবে দেখেছি এবং বুঝেছি তা তুলে ধরবো। আমার ভাবনায় এবং বিচারে তফাৎ থাকতেই পারে। তবে খুব একটা অমিল হবে না।আসলে জয়নাল উদ্দিন লস্কর কেমন এবং কতটা সময়োপযোগী মানুষ ছিলেন, তা লিখে বোঝানো দুরূহ।

কোন মানুষকে পরিমাপ করা যায় না। প্রত্যেকেই আলাদা এবং স্বতন্ত্র সত্বার অধিকারী। তবে কিছু কিছু বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে আমরা মানুষকে বিচার বিশ্লেষণ করি। এতে সবটা ধরা না পড়লেও কিছুটা অনুধাবন করা যায়।

সত্যিকার অর্থে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হলে শুধু মেধা-জ্ঞানে নয়, মনের দিক থেকেও অনেক বড় হতে হয়। যা সবার থাকে না। সেটা আমি জয়নাল উদ্দিন লস্করের সংস্পর্শে গিয়ে আন্দাজ করেছি। তিনি ছিলেন সেবা প্রবৃত্তির উদার মনের মানুষ। তাঁর কর্ম পরিচিতির পরিধি তার নিজগুণে বহুধা বিস্তৃত।

সৃষ্টিকর্তা একেক সময় আমাদেরকে এমন এক একজন মানুষের সান্নিধ্যে নিয়ে যান যা আমাদের মতো নগণ্যকে ধন্য করে। কারোর সাথে চললাম বলেই যে তার মৃত্যুর পর অযথা সুনামের ফিরিস্তি লিখতে হবে, সেই অজুহাতে আমি কলম ধরিনি। যা সত্য তা এমনিতেই প্রকট। জয়নাল উদ্দিন লস্কর ছিলেন নিয়মানুবর্তিতার মানুষ। শৃঙ্খলা পরায়ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সৃজনশীল মানুষকে তিনি খুব বেশি গুরুত্ব দিতেন। কেউ বিড়ি ফুকে বা অশালীন ভঙ্গিতে তার পাশে বসে অনর্থক কথা বলবে, পরনিন্দা পরচর্চা করবে, এমন মানুষকে তিনি পছন্দ করতেন না। প্রশ্রয় দিতেন না। একটা সুশৃঙ্খল গণ্ডি বজায় রেখে চলতেন। ভোরে ওঠে প্রাতঃভ্রমণ করতেন। কোমরের ব্যথায় জর্জরিত হবার আগে পর্যন্ত সেই নিয়মানুবর্তিতা বজায় ছিল।

খুব অল্প কথায় এটুকুই বলা যায়,

তিনি কাছের মানুষের প্রতি যেমন সদয় ছিলেন তেমনি দূরের মানুষের প্রতিও তার অকৃত্রিম দয়া ভালবাসা ছিল। লায়ন্স ক্লাব অব লালা তারই প্রচেষ্টায় গঠিত। প্রিয় কয়েকজন সহযোগী নিয়ে ক্লাবের অগ্রযাত্রায় তার ভূমিকা অপরিসীম। আর লায়ন্স ক্লাবটি ছিল তার অন্তঃপ্রাণ।

তাঁর ডাকেই লায়ন্স ক্লাব অব লালা'য় আমার অন্তর্ভুক্তি। থাক,আমার কথা। তাঁর কিছু প্রিয় মানুষের কথা বলে নিই। মনোয়ার হোসেন চৌধুরী (সেলিমদা) তাঁর প্রাণপ্রিয় এক সহচর বা সহযোগী। তিনি তাকে কাছের একজন বলেই ভাবতেন। সেলিমদাও সেই সম্পর্কের পূর্ণ মূল্য বজায় রেখে চলতেন। বোঝা যেতো তারা মানিক জোড়। একক সত্বা। আবার কখনো কখনো আদায় কাঁচকলায় ভাব জমে উঠতো। তাদের মধ্যে আসলে কি ঘটছে তা বোঝা যেতো না। সম্পর্কের এমন অটুট বন্ধন খুবই কম দেখা যায়। অবসরের পর প্রত্যেক মানুষই সঙ্গ খোঁজে, কিন্তু জয়নাল উদ্দিন লস্কর চিরকালই সঙ্গী পরিবেষ্ঠিত সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবন যাপনে ব্রতী ছিলেন। শুধু সেলিম চৌধুরী না, আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর নিবীড় সম্পর্ক ছিল। জয়নাল উদ্দিন লস্কর, প্রকাশ চান্দ সুরানা এবং অমিত রঞ্জন দাসের ঐকান্তিক প্রচেষ্ঠায় লালার প্রথম বেসরকারী বাংলা মাধ্যম স্কুল - মাতৃভাষা আদর্শ বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা হয়। তারা একসঙ্গে ঘুরতেন, আড্ডা দিতেন। অনেকের সাথে প্রিয় ভাই-বন্ধুর মতো তদ্বির করতেন আবার কখনো কখনো জোরকরে আদেশ অধিকার চাপাতেন। নূরুল মজুমদারকে তিনি সেরা সংগঠক হিসেবেই প্রাধান্য দিতেন। তাঁর কাছের এক বিশ্বস্ত মানুষ বলেই ভাবতেন। নুরুল আছে মানেই সব হয়ে যাবে, এরকম একটা আস্থাভাবের বীজপোঁতা ছিল তাঁর মনের গভীরে। আমি নিজে দেখেছি, অনুভব করেছি। অনেকের সঙ্গে একসাথে চলা, স্ফূর্তি-ইয়ার্কির সাক্ষী হয়েছি। আরও যে কত মানুষের সাথে এমন সখ্যভাব ছিল তা লিখে শেষ করতে পারবো না। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখেছি লায়ন্সের কর্মকর্তারা আগে জয়নাল সাহেবকে খুঁজতেন। কী জানি কি একটা অদ্ভুত মায়ামোহ টান অনুভব করতেন। তাদের সঙ্গে শুধু সাংগঠনিক সূত্রতা নয়, ব্যক্তি হিসেবেও গভীর হৃদ্যতা ছিল তাঁর। তারা তাঁর সাথে আলাপচারিতায় আলাদা মেজাজে আনন্দ উৎসাহ উপভোগ করতেন। সাংগঠনিক কাজকে জয়নাল উদ্দিন লস্কর যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন এবং সবাইকে সঙ্গবদ্ধ রাখার চেষ্টা করতেন। লায়ন্স কর্মকর্তাদের মনের জোর যে অসীম সেটা লায়ন জয়নাল উদ্দিন লস্করের কর্মস্পৃহায় ফুটে উঠতো। তিনি কোন কিছুতে বিচলিতবোধ করতেন না এবং যে কোনকিছু সামাল দেওয়ার তাৎক্ষণিক কৌশল তার রপ্ত ছিল। এই বিশেষ গুণাবলি নুরুলেরও প্রবল। তাই বোধহয় তারা হতে পেরেছিল জয়নাল উদ্দিন লস্করের পছন্দের সহযোগী কিংবা প্রিয় পাত্র।

সামাজিক কিংবা ধর্মিয় অনুষ্ঠান

আয়োজনে জয়নাল উদ্দিন লস্করের সাথে সেলিমদা আর নুরুলের দৌড়ঝাপের কোন খামতি ছিল না। স্যার এসবক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিতেন। সবাইকে উজ্জীবিত করে রাখতে জয়নাল স্যার এবং নুরুলের জুড়ি মেলা ভার। তাছাড়া, সমসাময়িক সাথী হিসেবে সাপ্তাহিক 'অনির্বাণ শিখা' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী নুরুল হুদা চৌধুরী এবং আরও অনেকেই ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ মানুষ। আর দূরে থেকেও আমি ছিলাম তাঁর অতি প্রিয় একজন। আমাকে যে কতটা স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন, ভরসা করতেন তা এই স্বল্প পরিসরে লিখে প্রকাশ করা মুশকিল। হাতে মাত্র দুদিন সময়। এরই মধ্যে এডিট, পেজ সেটিং সব হয়ে গেছে। এবার প্রিন্টিং করে সপ্তমীর সন্ধ্যায় ম্যাগাজিন উন্মোচন করে পাঠকের হাতে তুলে দিতে হবে। তদুপরি কিছু ছবি ও বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে স্যারের জন্য যেটুকু জায়গা বরাদ্দ করা গেল তাতেই ইতি টানতে হবে। তাড়াহুড়োর লেখা ভাল হয় না। অনেক কথা থেকে যায়। তাছাড়া, স্যারের প্রস্থানে আমরা শোকাচ্ছন্ন। লেখার সেই মন-মানসিকতাটাই নেই।

কখনো কখনো মনে হয়, আচ্ছা, তিনি এভাবে আমাদের ছেড়ে না গেলেও তো পারতেন! আমাদের মাঝে আরও কিছুদিন থাকলে কী অসুবিধা হতো বিধাতার। অথচ মর্জি মালিকের।

তিনি ভেতরে ভেতরে রোগের প্রকোপে ভীষণ কষ্ট পেয়েছেন। যন্ত্রণায় ধুকেছেন। কিন্তু কাউকে কখনো বুঝতে দেননি। ব্যতিব্যস্ত করে তুলেননি। সব ব্যথাকষ্ট নীরবে সহ্য করে গেছেন। সাহসিক চিত্তে চিরতরুণের মতো নিজের উপস্থিতি জাহির করেছেন মঞ্চে-মজলিসে। দুর্দান্ত সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক হয়ে বিরাজমান ছিলেন আমাদের মাঝে। মাস দেড়েক আগেও লায়ন্স ক্লাব অব লালা আয়োজিত শিক্ষক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন।

মঞ্চকে শোভিত করেছেন। অতঃপর অশুভ অক্টোবরের ১৪ তারিখ সকাল ১০:৫৬ মিনিটের সেই অন্তিমক্ষণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন চিরতরে। আমরা শোকে মূহ্যমান। সাধারণের ভিড়ে এক অসাধারণ মানুষের নিথর হওয়ার খবর শোনলাম! অভিভাবকহীন মনে হতে লাগলো নিজেকে।

সেদিন সকাল বেলা স্কুলের পথ ধরেছি। সেলিমদা অর্থাৎ মনোয়ার হোসেন চৌধুরী, স্যারের সেই বিশ্বস্ত সজ্জন; বেশ ক্ষোভের সাথে আমাকে ফোন করে জানালেন- ওরা কেউ আসল খবর দেয় না। মিথ্যে আমাদেরকে আশ্বস্ত করে। তিনি ভাল হচ্ছেন, সুস্থ হচ্ছেন বলে আপডেট দেয়। কিন্তু তিনি মোটেই ভাল নেই। তাঁর বড়ছেলে সামিমের সাথে ফোনে আমার কথা হয়েছে। সে বলেছে, তাঁর অবস্থা সুবিধার নয়। ব্রেইন ফাংশন ঠিকই আছে, তবে কথা বলতে পারছেন না। শুধুই চেয়ে রয়েছেন। তাঁর অবস্থার কোনও উন্নতি নেই...। শুনে আমার বুক ধড়ফড় করছিল। শহরে তখন মহালয়ার প্রভাত ফেরি চলছে। মাইকে আগমনীর সঙ্গীত বাজছে। ফোন লাউডস্পিকারে থাকা সত্ত্বেও সেলিমদার কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল না। সেলিমদাকে বললাম- করার কী আছে, দোয়া ছাড়া। তিনি বললেন- আমি মাদ্রাসায় খতম পাঠের বন্দোবস্ত করতে যাচ্ছি...। দোয়া করবেন। এইবলে তিনি ফোন ছাড়লেন। আমি ই-রিক্সা থেকে নামলাম। মহালয়ার একটি বিশাল ফেরি সমস্ত রাস্তাজুড়ে আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। তবুও আমার সামনে সব যেন ফিকে, শুনশান। স্কুলে যাবার গাড়ি বা অটো কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। অপেক্ষারত অবস্থায় স্যারের কথা মনে পড়ছে। এই তো ৭ অক্টোবর পর্যন্ত মানুষটি পুরোদমে ছিলেন। প্রতিদিন ওয়াটসঅ্যাপে ম্যাসেজ করেছেন। সুপ্রভাত জানিয়েছেন। এটা যেন তাঁর আমার এবং গ্রুপের রোজকার রুটিনমাফিক একটা কাজ ছিল। ভাল ভাল অনুপ্রেরণামূলক লেখা এবং ভিডিও পাঠাতেন। হ্যাঁ, মানুষকে তার কাজে উৎসাহিত করা এবং গঠনমূলক বিষয়ে অনুপ্রেরণা দেওয়াই ছিল তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

মাস কয়েক আগে স্যারের বাসায় গিয়েছিলাম। তাঁকে দেখে শুষ্ক হাসি ছাড়া দেয়ার মতো আমার কাছে কিচ্ছু ছিল না। তিনি কি আদৌ বুঝতে পেরেছিলেন, সেদিন তাঁকে দেখে গরম শিক পুড়িয়ে ছ্যাকা দেয়ার মত কষ্ট পেয়েছিল আমার মন। মিসাইলের মতো আঘাত হেনেছিল আমার মস্তিষ্কের নিউরনে? তার সেদিনের বিছানা থেকে উঠে বসার বারংবারের ব্যর্থ প্রচেষ্টা আমাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছিল। কোন মানুষকে অসুস্থকালে আরাম দিতে না পারলে নিজেকে কেমন যেন অসহায়, লাচার মনে হয়। কিন্তু স্যারের ওই একটাই সমস্যা ছিল- তাঁকে অসুস্থ মনে করা হচ্ছে ভাব দেখলেই তিনি রাগ করে ফেলতেন। তাকে সুস্থ মনে করতে হবে এবং তবিয়তের হাল পুছতে গেলেই মোটামুটি গোল বেঁধে যেতো। শেষের কয়েকদিন লাঠির সহায়তা নিলেও তিনি দিব্যি ভাল এবং আরামে আছেন বলে সহাস্যে জানাতেন। কতটা ভাল, সেটা আমি আন্দাজ করতে পারতাম না। শুধু কথাবার্তায় বুঝতাম তিনি তখনও প্রাঞ্জল।

আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেলিছি চিরদিনের মতো। একথা ভাবলে নিজেকে আর আগের মতো নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না! একবুক কষ্ট বুক চেপে বসে। নিজের চোখে নিজের প্রিয় মানুষের চির প্রস্থান দেখার মতো দুর্ভাগ্য আর হয় না।

আজ তাঁর আড়াল হয়ে গেছি ঠিক, কিন্তু এই যে প্রায়শই শেষরাতে চোখ বুজে তাকে দেখে, তাঁর কথা ভেবে আতকে ওঠা, বুকের মাঝে চিনচিন ব্যথাধরা নিয়ে বাকহীন বসে থাকা, এসব কোন মায়াজালের চমক?

প্রায়শই তাঁর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ভাসে চোখের সামনে। ছবিতে দেখি- আমরা আছি, তিনি নেই! কেউ রক্তে মিশে গেলে তাকে আর ভোলা যায় না।

চির তরুণ খ্যাত প্রাণোচ্ছল জয়নাল স্যারের শেষ সময়ের সেই দুরাবস্থা আমাকে ভীষণ ভাবে পীড়া দিতো। অথচ করার কিছুই ছিল না। জীবনে এমন এক এক সময় আসে যখন জনশক্তি কাজ দেয় না। কখনো বা এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যা টাকায় সুরাহা হয় না। তখন স্রষ্টার উপর হাল ছেড়ে দিতে হয়। সেটাই হয়েছে। আমরা তাঁকে হারালাম এবং ধার্মিক রীতি রেওয়াজ মোতাবেক তাঁকে সেই মহান স্রষ্টার হাতে সঁপে দিলাম, যেথায় একদিন আমাদেরও যেতে হবে। হয়তো আবারও দেখা হবে পরজীবনে। তাঁর প্রতি রইলো আমাদের অগাধ শ্রদ্ধা এবং সীমাহীন ভালোবাসা। আল্লাহ তাঁকে জান্নাত নসিব করুন।

<><><><>

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানায়
আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন –

PRAKASH ENTERPRISES

GROUND FLOOR, HOTEL SHYAMA INN, JANIGANJ BAZAR,
SILCHAR, DIST- CACHAR, ASSAM-788001

MOBILE : 7002504799, 7002802208

AUTHORISED DISTRIBUTOR

Livguard | RISHABH FAN | KENT Smart Chef Appliances

LIVGUARD -----EVEREADY -----KENT-----RISHABH FAN

BVCL
Valley Strong Cement

শারদ শুভেচ্ছা

Valley Strong
CEMENT

Phone : 03843-269435, 269881

Hailakandi (Bengali News Magazine), Vol.-28, No.-6, RNI Regd. No. 64351/96 INR-₹50

শারদীয় দুর্গোৎসব ও দীপাবলি উপলক্ষে আপামর জনসাধারণকে জানাই আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

য়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।

ড° হিমন্তবিশ্ব শর্মা
মুখ্যমন্ত্রী, অসম

আনন্দমুখর শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে
সকলের সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি-

গৌতম গুপ্ত
সভাপতি, ড্রিমস,
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, হাইলাকান্দি

Edited, Printed & Published by Jarin Aktar Mazumder on behalf of N. M. Creations, Lala
Dist.-Hailakandi, Assam, E-mail : nmazumderhkd@gmail.com, Phone : 8638898750